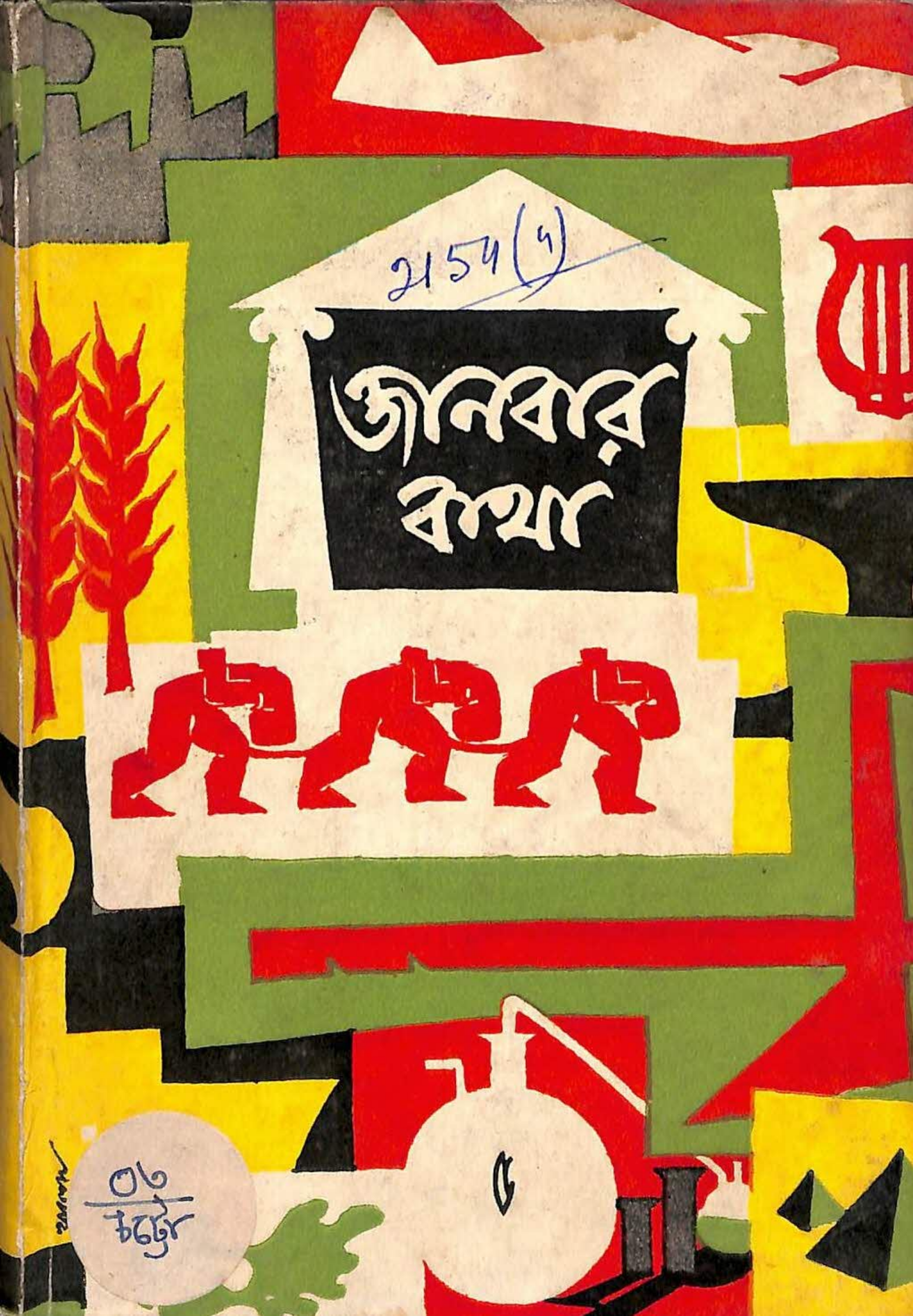

জানবার
কথা

জানবার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

স্বাক্ষর

১১-বি, চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা ২০

॥ প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ ॥

প্রকাশক : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর : নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৮/১, লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—১ ॥ বাঁধিয়েছেন : ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্ ১০০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৯ ॥ গণশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ॥ ব্লক : ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানী, ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯ ॥

যাঁরা ব্লক তৈরি করেছেন : অমৃতলাল দাস, প্রফুল্ল বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস। যাঁরা শিসের হরফ সাজিয়েছেন : সুকুমার দত্ত, প্রশান্ত নিয়োগী বিশ্বনাথ মৈত্র, মণীন্দ্রনাথ দত্ত, ভোলানাথ চক্রবর্তী, সুধীর সাহা। যাঁরা ছাপার যন্ত্র চালিয়েছেন : নারায়ণ দাস, গৌরহরি স্বর্ণকার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুদেব দে। যাঁরা বই বাঁধিয়েছেন : আব্দুল হামিদ মিয়া, অনিলচন্দ্র বসাক, গৌরীশঙ্কর দত্ত।

॥ দাম : প্রতি খণ্ড আড়াই টাকা ॥

পরিবেশক : বেঙ্গল পাব্লিশার্স

জানবার কথা

॥ লিখেছেন ॥

অশোক ঘোষ
চিন্মোহন সেহানবীশ
জগদীশ দাশগুপ্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
প্রভাত দাশগুপ্ত
প্রশান্ত সান্যাল
মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রমাকৃষ্ণ-মৈত্র
শ্যামল চক্রবর্তী
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

॥ ছবি এঁকেছেন ॥

অমূল্য দাশ
জ্যোৎস্না ঘোষ-দস্তিদার
প্রবীর দাশগুপ্ত
হরনারায়ণ দাশ

॥ প্রচ্ছদপট ॥

খালেদ চৌধুরী

॥ উৎসর্গ ॥

যারা দুনিয়াকে জেনে দুনিয়াকে বদলাবে
যারা আলো জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে
নতুন ভবিষ্যৎ যারা মুঠোয় আনবে
আমাদের দেশের সেই ছোটো ছোটো
ছেলেমেয়েদের
উদ্দেশে



যন্ত্রশিল্পের কথা

হাতে ওটা কিসের প্যাকেট ?

পুজোর নতুন জামা।

দর্জি কাপড়ের থান থেকে মাপমতো কাপড় কেটে নিয়ে ছাঁটকাট করে জামা বানিয়ে দিয়েছে।

কাপড়ের থান তৈরি হয়েছে কোথায় ? কারখানায়। সুতোকলে মেশিন চালিয়ে কাপড়ের থান তৈরি করেছে শ্রমিকেরা।

মেশিন চালিয়ে শুধু কাপড় নয়, ছোটো বড়ো নানান রকম

জিনিস তৈরি হয়। যে-বাসে চেপে নতুন জামাটা নিয়ে বাড়ি ফিরলে সে-বাসও মেশিনে তৈরি। যে-রেলগাড়িতে চেপে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাবে, সে-রেলগাড়িও মেশিনে তৈরি।

বেশির ভাগ মেশিনই ধাতু দিয়ে তৈরি।

কখনো লোহা কাটবার চেষ্টা করেছো। লোহা ভীষণ শক্ত ধাতু, সহজে কাটা যায় না। কিন্তু এমন অনেক মেশিন আছে যাতে খুব সহজেই কুচ-কুচ করে লোহা কেটে ফেলা যায়—ছুরি দিয়ে পেন্সিল কাটার মতো।

মেশিন না হলে আধুনিক সভ্যতা অচল। জামাকাপড়, ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে মোটরগাড়ি, এঞ্জিন, জাহাজ, এরোপ্লেন —সর্বত্রই মেশিন।

আমাদের ভারতবর্ষে মেশিন কম, কারখানা কম। আমাদের দেশে যদি আরো নানান ধরনের মেশিন আরো অনেক থাকতো তাহলে আমাদের ভারতবাসীর জীবন আরো স্বচ্ছল হতো, দেশের বেশির ভাগ মানুষ সস্তা দামে দরকারমতো জিনিসপত্র ব্যবহার করার সুযোগ পেতো।

আগেকার দিনে মেশিন ছিলো না। তখন কারিগরেরা তাদের নিজের নিজের বাড়িতে বসে হাতে-হাতে জিনিস তৈরি করতো। সকালে উঠে কাজের জায়গাটাকে ঝাড়-পোঁছ করে নিয়ে তারা কাজ শুরু করে দিতো। তাঁতি কাপড় বুনতো, মুচি জুতো বানাতো, কামার কাস্তে-হাতুড়ি ছুরি-কাঁচি তৈরি করতো, কুমোর মাটির পাত্র গড়তো। অপরূপ সুন্দর সেই সব

হাতের কাজ! ঢাকাই মসলিনের তো জগৎ-জোড়া নাম ছিলো।

কিন্তু মুশকিল হলো, হাতে-হাতে জিনিস তৈরি করতে বড্ডো সময় লাগে! আর জিনিস তৈরি করতে সময় যতো বেশি লাগবে তার দামও ততো চড়া হবে। আর সময় বেশি লাগবে বলে জিনিস তৈরিও হবে কম। ফলে, সব মানুষের দরকারি জিনিস তৈরি হতে পারবে না। সবাই সব জিনিস পাবে না।

প্রায় তিন শো বছর আগে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা জিনিস তৈরি করার এক নতুন উপায় বার করলো—তারা মেশিন বানাতে শিখলো।

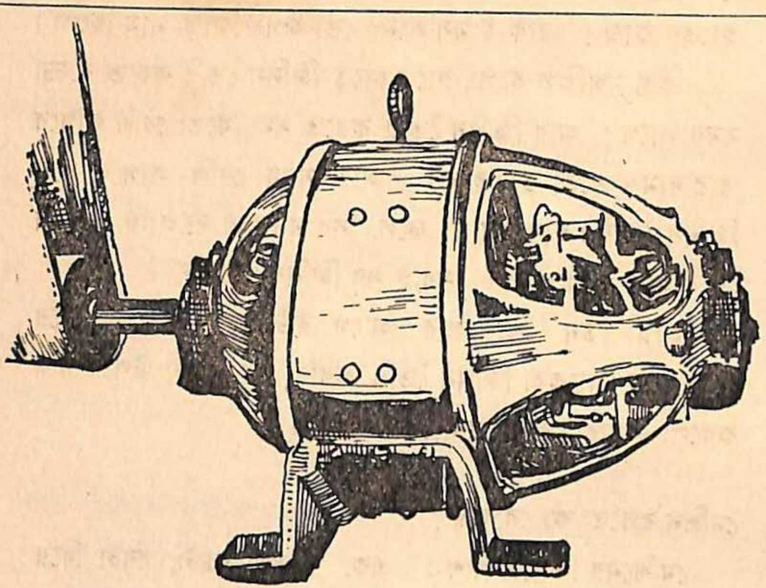
মেশিন বলতে কী বোঝায়?

মেশিনের তিনটে অংশ: এক, আসল যন্ত্রটা, যেটা দিয়ে কাজটা হবে। একে বলে 'টুল'। দুই, সেই অংশ যেটার জোরে আসল যন্ত্রটা—'টুলটা'—চলবে। একে বলে 'মোটর'। তিন, সেই অংশ যেটা 'মোটর'-এর শক্তিটাকে 'টুল'-এর কাছে পৌঁছে দেবে। এই অংশটা 'বেল্ট' বা 'গিয়ার'।

ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে বুঝে দেখা যাক।

ধরো, একজন শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। শাবলটা ওঠা-নামা করছে কিসের জোরে? হাতের পেশির জোরে। পেশির জোরটা হাত বেয়ে শাবলে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

মেশিন চালাতে গেলে জোরটা আসে কোথা থেকে? মোটর থেকে। মোটরটা বাষ্পের বা ইলেক্‌ট্রিকের জোরে ঘুরছে, তার মধ্যে একটা জোর বা 'শক্তি' তৈরি হচ্ছে। মোটরের সেই শক্তি-



ইলেকট্রিক মোটর। বাঁ পাশে রড্‌টার সঙ্গে বেল্ট লাগানো।

টাই 'টুল'-কে—ছুরি বা হাতুড়ি বা তুরপুনকে—চালাচ্ছে। মানুষের হাতজোড়া খাটুনির হাত থেকে ছাড়া পাচ্ছে।

কিন্তু, মোটরের জোরটা টুল-এর ওপরে গিয়ে পৌঁছবে কী করে? তার জন্যেই চাই বেল্ট বা গিয়ার। মোটর ঘুরছে, তার সঙ্গে মোটরের সঙ্গে জুড়ে-দেওয়া বেল্ট বা গিয়ারও পাক খাচ্ছে, টুলটাও সঙ্গে সঙ্গে চলছে: ছুরি-টুল কাটছে, হাতুড়ি-টুল পিটছে, তুরপুন-টুল বিঁধ করছে।

তবেই দেখো, মেশিন অল্প সময়ে কতো বেশি জিনিস তৈরি করতে পারে।

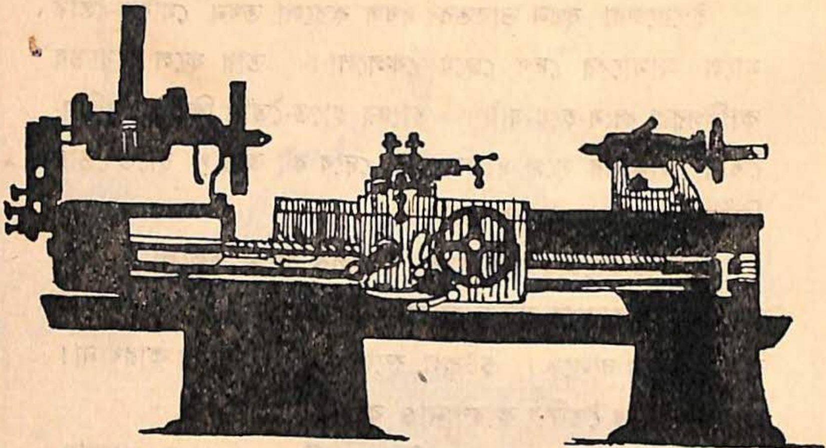
ইংরেজেরা যখন ভারতবর্ষ দখল করলো তখন মেশিন-তৈরি মালে আমাদের দেশ ছেয়ে ফেললো। তার ফলে ভারতের কারিগররা ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের হাতে-তৈরি জিনিস মেশিন-তৈরি জিনিসের সঙ্গে দামে পাল্লা দেবে কী করে? হাতে-তৈরি জিনিসের দাম যে অনেক বেশি।

তারপর ইংরেজেরা ভারতবর্ষেই কলকারখানা খুললো, মেশিন বসালো। তারপর আস্তে আস্তে আমাদের দেশে এখন অনেক কলকারখানা বসেছে। চটকল, সুতোকল। চিনির কারখানা। লোহা-ইস্পাত তৈরির কারখানাও কয়েকটি আছে।

কিন্তু তবু ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা-সোবিয়েত দেশের তুলনায় আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। তাই আমাদের দেশ অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় অনেক গরিব। তাই আমাদের দেশে সব লোকে চাকরি পায় না। কারণ, মেশিন মানেই দৌলত, মেশিন মানেই কাজ।

তাই ভারতবর্ষে আরো আরো আরো মেশিন চাই: রোজকার দরকারি জিনিস তৈরির মেশিন তো চাইই, মেশিন তৈরির মেশিনও অজস্র চাই।

লেদ কাকে বলে জানো? লেদ-এ বাটালির মতো একটা ধারালো যন্ত্র থাকে। ছুতোর মিস্তিরি সেই বাটালি হাতে ধরে কাজ করে। মেশিনে সেটা একটা লোহার সঙ্গে লাগানো থাকে। লেদ ইলেকট্রিকে চলে। লেদ দিয়ে কী কাজ হয়? মনে করো, একটা তামার টুকরোকে ছেঁটে চেঁছে একটা নির্দিষ্ট চেহারায়



লেদ

আনতে হবে। লেদ তামার টুকরোটাকে ধরে ক্রমাগত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাটালিটার সঙ্গে লাগিয়ে রাখে, টুকরোটা কিছুক্ষণ পরেই নির্দিষ্ট চেহারা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এ তো মামুলি লেদের কথা। অটোমেটিক লেদের কাজ আরো চমৎকার। তাতে মানুষের হাত তেমন বিশেষ লাগাতে হয় না। মনে করো, যে মেশিন চালাচ্ছে সে শুধু মেশিনে লোহার রড জুগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তারপর মেশিন আপনার থেকেই ধাপে ধাপে কাজ করে মাপমতো বল্টু তৈরি করে মেশিন থেকে বার করে দিচ্ছে। পাশের মানুষটির রড জুগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে হচ্ছে না।

শুধু লেদ নয়, এই ধরনের অটোমেটিক মেশিন আরো অনেক আছে।

মনে করা যাক, একটা আধুনিক ফ্যাক্টরিতে গেছি। কী দেখবো? বিরাট একটা হলঘর। সারি-সারি মেশিন বসানো। আর সেই সার-সার মেশিনের পাশ দিয়ে একটা অবিরাম স্রোত বয়ে চলেছে।

স্রোত—কিন্তু জলের স্রোত নয়। টুকরো-টুকরো অংশ একের পর এক মেশিনগুলোর পাশ দিয়ে একনাগাড়ে বয়ে চলেছে। চলতে-চলতে তারা একটা মেশিনের সামনে এসে থামলো। সেই মেশিন হয়তো তাদের একটু বাঁকিয়ে গেলো। সেখান থেকে

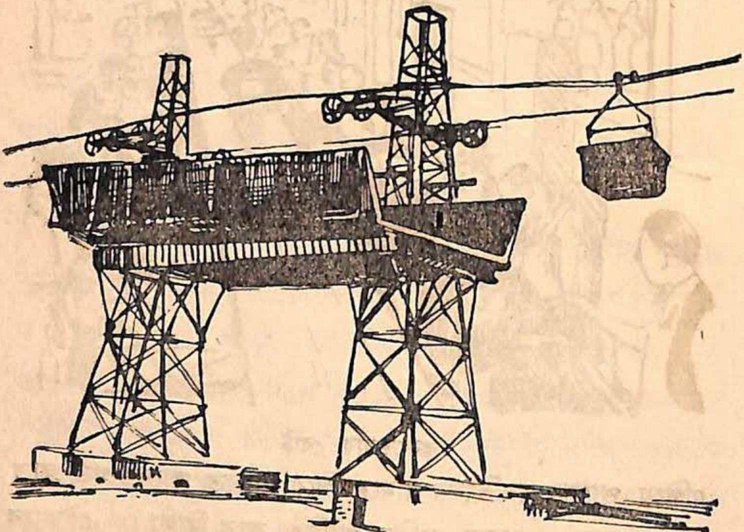


কন্‌ভেয়ার বেল্ট

এগিয়ে পাশের মেশিনের সামনে গিয়ে থামতে তাদের গর্ত করে দেওয়া হলো। পরের মেশিন পালিশ করে দিলো। এইভাবে ধাপে ধাপে এগোতে এগোতে গোটা জিনিসটা পাকাপাকি তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলো।

প্রত্যেকটি মেশিনে কোন কাজ কতোক্ষণ হবে তা একেবারে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় হিসেব করা। সময়ের একটু এদিক-ওদিক হলেই সমস্ত শৃঙ্খলা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। পালিশের জন্যে সময় ঠিক করা আছে হয়তো ৪০ সেকেণ্ড। পালিশ-মেশিনে যে কাজ করছে সে যদি ৪৫ সেকেণ্ড লাগিয়ে দেয় তাহলে তার পরের সব কাজ ভণ্ডুল হয়ে যাবে। অংশগুলো তার কাছে এসে জমতে থাকবে, ক্রমেই আর সে সামাল দিতে পারবে না, ফলে গোটা কাজটাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে।

আধুনিক ফ্যাক্টরিতে এইভাবেই কাজ চলে।



আর একরকম কন্‌ভেয়ার বেল্ট

ছাপাখানার কথা

ছাপাখানার কথা বুঝতে হলে তিনটি কথা সব সময়ে খুব ভাল করেমনে রাখতে হবে :

[১]	[২]	[৩]
কীসের ছাপ ॥	কী দিয়ে ছাপ ॥	কার ওপর ছাপ ॥

এই যে ছাপা লেখাগুলো পড়ছো, এখানে কাগজের ওপর কালি দিয়ে বাঙলা হরফের ছাপ ফেলা হয়েছে।

হরফের কথা প্রথমে বলবো।

নিবের ডগায় কালি লাগিয়ে কাগজের ওপর পাঁচটা আঁচড় কাটলাম : বাঙলা হরফ 'ক' ফুটে উঠলো। এ হলো লেখা। ছাপার সময়ে ?

এক টুকরো কাঠের ওপর ঐ পাঁচটা আচড়ই কাটলাম। তারপর আঁচড়-কাটা জায়গাটাকে চেঁছে ফেললাম। হরফটা উচু হয়ে জেগে রইলো, বাকি জায়গাটা পড়ে রইলো তার নিচে।

তা হলে কী হলো ? একটা কাঠের হরফ তৈরি হলো : 'ক'। এখন হরফের গায়ে কালি লাগিয়ে কাগজের ওপর ছাপ ফেললেই কাগজের ওপর পেয়ে যাবো 'ক'। ছাপাখানায় এই হরফ-তোলা কাঠের টুকরোকে বলে 'টাইপ'। টাইপ তৈরি হয় উল্টোভাবে লিখে। নইলে সোজা ছাপ পড়বে কী করে ? দোলের সময় তোমরা যখন আলুর ওপর 'গাধা' লিখে বন্ধুর গায়ে ছাপ দাও, তখন তো উল্টো করেই লেখো। নয় কি ?

আজকাল আমরা সাধারণত কাঠের টাইপ ব্যবহার করি না। ধাতুর টাইপ ব্যবহার করি। কী কী ধাতু ? সিসে (শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ), অ্যান্টিমনি (শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ) আর টিন (শতকরা প্রায় ১২ ভাগ)। সিসে নরম জিনিস, অ্যান্টিমনি মিশিয়ে তাকে শক্ত করে নেওয়া হয়, আর তার ফলে টাইপের ছাঁদটা বেশ চোখা হয়ে ওঠে।

বাঙলা বই ছাপতে কতোগুলো টাইপ লাগে শুনবে ? স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, সংখ্যাচিহ্ন, কমা-দাঁড়ি ইত্যাদি সব মিলিয়ে বাঙলা টাইপের সংখ্যা হলো ৫৬৩। পাঁচ শো তেষট্টি ! ইংরেজিতে লাগে ১৫২টি টাইপ।

এতো অগুনতি টাইপকে সাজিয়ে-গুছিয়ে না রাখলে কাজ চলে না। এই উদ্দেশ্যে ছাপাখানায় বড়ো বড়ো কাঠের ডালা তৈরি করানো হয়। তার মধ্যে অনেকগুলো খুপরি বা ঘর থাকে। এক-এক ঘরে এক-একটা হরফের টাইপ ঢেলে দেওয়া হয়। সব ঘরগুলো একই মাপের হয় না—কোনোটা বড়ো,

কোনোটা ছোটো। কেন? কোন ঘরে কোন টাইপ থাকবে তাও ঠিক করা আছে। কেন? যে টাইপগুলো খুব বেশি দরকার হয় সেগুলো থাকে কোলের দিকের বড়ো-বড়ো ঘরে। এই কাঠের ডালাগুলিকে বলা হয় 'কেস'। বাঙলায় চারখানা কেস লাগে। একখানা সেগুন কাঠের ফ্রেমের ওপর কেসগুলিকে সামনে-পাশে সাজিয়ে কাজ করা হয়।

দরদরবেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজিরে

এই লাইনটায় কটা হরফ আছে গুনে বলবে? ২৯টা না? কেসের থেকে একের পর এক ২৯টা টাইপ তুলে পাশাপাশি সাজিয়ে এই লাইনটা গাঁথা হয়েছে। ছাপাখানায় যাঁরা এই টাইপ-গাঁথার কাজ করেন তাঁদের নাম কম্পোজিটর। কম্পোজিটরের বাঁ হাতে থাকে একখানা পেতলের পাত, তার নাম 'ষ্টিক'। ডান হাত দিয়ে এক-এক ঘর থেকে এক-একটা টাইপ তুলে ষ্টিকের ওপর পরের পর ফেললেই এক-একটা লাইন গাঁথা হয়ে যায়। কোন ঘরে কোন টাইপ আছে তা কম্পোজিটরের মুখস্থ—চোখ দিয়ে দেখতেও হয় না, লেখার দিকে চোখ রেখে তিনি ঠিক ঘর ঠিক টাইপটি তুলে আনেন। এইভাবে কয়েক লাইন গাঁথলেই ষ্টিক ভরতি হয়ে যায়। তখন তিনি গাঁথা লাইনগুলোকে ষ্টিক থেকে 'গ্যালি'তে চালান করেন। গ্যালিটা কী? গ্যালি হলো—দুদিকে-বাটাম-লাগানো সেগুন কাঠের তক্তা। কিছুক্ষণ পর পর যেই ষ্টিক ভরতি হয়ে যায় অমনি তিনি ষ্টিক থেকে গাঁথা লাইনগুলোকে নামিয়ে গ্যালিতে পরের পর তুলে রাখেন।

একটা স্কেল দিয়ে এই পাতাটার ছাপা জায়গাটার বহরটা মেপে ফেলো। ৬ ইঞ্চি হচ্ছে তো? আমরা বই ছাপতে দেবার সময়ে ছাপাখানাকে বলে দিয়েছিলাম প্রত্যেক পাতার ছাপা অংশের বহরের মাপ হবে ৬ ইঞ্চি।

ছ-সাতটা গ্যালি গাঁথা লাইনে ভর্তি হয়ে গেলে কম্পোজিটর একটা স্কেল নিয়ে আমাদের ফরমাশমতো সমস্ত গাঁথা লাইনকে ৬-৬ ইঞ্চিতে ভাগ করে দড়ি দিয়ে আলাদা-আলাদা করে বেঁধে ফেলেন। এইভাবে যখন ৬ ইঞ্চি মাপের ষোলোটা পাতা বাঁধা হলো, তখন জিনিসটা ছাপার মেশিনে চড়বার জন্যে তৈরি হলো।

ষোলো পাতা কেন? সাত বা তেরো বা অন্য যে-কোনো সংখ্যার পাতা হলে হবে না?

এ-প্রশ্নের জবাবটা কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবি থাকুক। তার আগে ছাপার মেশিনের কথাটা আলোচনা করে নেওয়া যাক।

ঐ ষোলোটা পাতাকে মেশিনঘরে নিয়ে গিয়ে একটা বড়ো প্লেন লোহার পাতের ওপর সাজানো হলো। পাতাগুলিকে পরের পর এক-তুই-তিন করে সাজালে চলবে না—সাজানোর একটা বিশেষ কায়দা আছে, ছবিতে দেখলে বুঝতে পারবে। তারপর ষোলোটা পাতার চারপাশ দিয়ে একটা লোহার ফ্রেম ফেলে দিয়ে, স্ক্রু পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ফ্রেমের মধ্যে পাতাগুলিকে এঁটে ফেলা হয়। লোহার ফ্রেমটাকে বলা হয় 'চেজ'। 'চেজ'-এ আঁটা ঐ এক-এক প্রস্থ ষোলো-পাতার নাম 'ফর্মা'। ফর্মাটাকে মেশিনে চড়িয়ে ছাপতে হবে।

ছাপার সমস্যাটা কী ? কাগজের ওপর ঐ ষোলো পাতার ছাপ ফেলতে হবে—এই তো ! তোমাকেই যদি এ-সমস্যাটার সমাধান করে দিতে বলি ! তুমি হয়তো বলবে, কেন, খুব সোজা। পাতাগুলোর ওপর কালি মাখিয়ে, তার ওপর সাদা কাগজ ফেলে সব পাতাগুলোর ওপর সমান ছাপ দিয়ে গেলেই ছাপা কাগজ উঠে আসবে।

ঠিক কথাই বলেছো। আগে এইভাবেই ছাপা হতো। আজকাল হয় না। কেন ? প্রথমত, এতে সময় লাগে অনেক বেশি, আর দ্বিতীয়ত, ছাপাও তেমন ঝরঝরে হয় না।

॥ সিলিণ্ডার মেশিন ॥

আধুনিক ছাপার মেশিনে দু-দিকে দু-সার রোলার বসানো থাকে। তার ওপর একটা লোহার পাত পেতে ফর্মাটাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। যে লোহার পাতের ওপর ফর্মাটা শোয়ানো থাকে তাকে বলে 'টাইপ-বেড' অর্থাৎ টাইপের বিছানা। দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো রোলারগুলো একবার এগিয়ে যায়, একবার পেছিয়ে আসে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে টাইপ-বেডটাও একবার এগোয়, একবার পেছোয়। যখন এগোয়, তখন মেশিনের ও-পাশের কয়েকটা কালিমাখা রোলার ফর্মার গায়ের ওপর ভালো করে কালি মাখিয়ে দেয়।

সিলিণ্ডার কাকে বলে তা আগেই পড়েছো। ছাপার মেশিনেও একটা সিলিণ্ডার দরকার হয়। মেশিনের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় সিলিণ্ডারটা বসানো থাকে। সিলিণ্ডারটা ঘোরে। সিলিণ্ডার-

টার গায়ে কাগজ জড়িয়ে দেওয়া হয়। সিলিণ্ডারটা ঘুরতে-ঘুরতে যখন কালিমাখা ফর্মার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায় তখন কাগজটার ওপর হরফের ছাপ ধরে যায়। এই সিলিণ্ডারওয়ালা ছাপার মেশিনকে বলে সিলিণ্ডার মেশিন।

কিন্তু সিলিণ্ডার কি সব সময়েই ঘুরছে ? এর জবাব হলো : না এবং হ্যাঁ। কোনো কোনো মেশিনে সিলিণ্ডারটা একপাক ঘুরে কিছুক্ষণ থামছে। টাইপ-বেডটা যখন কাগজে ছাপ লাগিয়ে মেশিন-ম্যানের কোলের দিকে ফিরে আসছে তখন সিলিণ্ডারটা থেমে পড়ছে। এই ধরনের মেশিনকে বলে এক-পাক-ঘোরা সিলিণ্ডার মেশিন।

আবার দু-পাক-ঘোরা সিলিণ্ডার মেশিন আছে। সেই মেশিনে টাইপ-বেডটা যখন ফিরে আসে মেশিনম্যানের দিকে, তখন সিলি-ণ্ডারটা থামে না, ঘুরতে থাকে—কিন্তু সামান্য একটু উঁচুতে উঠে ঘুরতে থাকে। কেন উঁচুতে উঠে যায় বলতে পারো ? তা না হলে যে সিলিণ্ডারের ঘুরনির চাপ লেগে সিসের হরফ সব ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। দু-পাক-ঘোরা মেশিনে খুব তাড়াতাড়ি ছাপা হয়। কেন ? একবার থেমে আবার ঘোরা শুরু করতে খানিকটা সময় চলে যায় তো। দু-পাক-ঘোরা মেশিনে এই সময়টা বেঁচে যায়। তাই সে চলে অনেক জোর কদমে।

বই, পত্রিকা (দৈনিক খবরের কাগজ নয় কিন্তু) ইত্যাদি সিলিণ্ডার মেশিনেই ছাপা হয়।

॥ রোটারি মেশিন ॥

খবরের কাগজ ছাপবার জন্যে অন্য ধরনের মেশিন ব্যবহার

করা হয়। তার নাম 'রোটারি' মেশিন। একটা আধুনিক রোটারি মেশিন একটা ৩২ পাতার খবরের কাগজ ছাপবে ঘণ্টায় হাজার হাজার। কী দুর্দান্ত স্পীড সেই মেশিনের একবার ভেবে দেখো। 'রোটারি' মেশিন সম্বন্ধে আরো দু-চার কথা সপ্তম খণ্ডে বলা হবে।

॥ প্ল্যাটেন মেশিন ॥

ছাপাখানায় আর-এক ধরনের মেশিন দরকার হয়। তার নাম প্ল্যাটেন মেশিন। প্ল্যাটেন মেশিনে চিঠির কাগজ, বিল, ক্যাশমেমো, রসিদ ইত্যাদি ছোটো-ছোটো জিনিস ছাপা হয়।

প্ল্যাটেন মেশিনে কীভাবে ছাপা হয় দেখা যাক।

'সুইং ডোর' নিশ্চয়ই দেখেছো। অনেক সুইং দরজা দুদিকেই যাতায়াত করে, আবার এমন সুইং দরজা আছে যা শুধু এক-দিকেই বেঁকে। প্ল্যাটেন মেশিনের কৌশলটা বোঝার জন্যে আমরা এক-দিকে-বেঁকা সুইং দরজার ছবিটা সামনে রাখবো।

মনে করো, তুমি সুইং দরজার ঠিক গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছো। ঘরের ভেতর থেকে কেউ হয়তো দরজার পাল্লাটা টেনে টেনে কেবলি তোমার পিঠের ওপর ফেলছে। এখন, তোমার পিঠের ওপর যদি এক পোঁছ করে রঙ লাগিয়ে যাওয়া হয় আর দরজার পাল্লাটার ওপর একখানা করে সাদা কাগজ এঁটে দিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কী হবে? প্রত্যেকটা কাগজের ওপর এক পোঁছ রঙ লেগে যাবে না?

প্ল্যাটেন মেশিনও এই কায়দায় চলে। ছবিতে দেখো,

টাইপ-বেডটা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। একটুও নড়ছে না। তার সামনের দিকে থেকে কাগজ-লাগানো প্ল্যাটেনটা কালিমাখা টাইপ-বেডটাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে আর কাগজে ছাপ পড়ে যাচ্ছে।

প্ল্যাটেন যখন ছাপা কাগজটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, তখন মেশিনম্যান ছাপা কাগজটা তুলে নিয়ে নতুন কাগজ লাগিয়ে দিচ্ছে। প্ল্যাটেন মেশিনে ছাপার কাজ এইভাবেই এগোয়।

॥ কাগজ ॥

একটা প্রশ্নের জবাব তোমার পাওনা আছে : ফর্মা কেন ষোলো পাতায় হবে ? পাঁচ পাতা বা এগারো পাতায় কেন হবে না ?

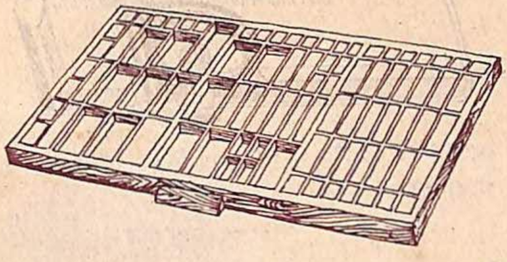
এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে কাগজ সম্বন্ধে কিছু খবর জানা দরকার। কাগজ নানান মাপের হয়। এদেশে বই ছাপার কাজে সাধারণত তিন মাপের কাগজ ব্যবহার করা হয়। তোমার ইস্কুলের বেশির ভাগ বইই যে-মাপের কাগজে ছাপা হয় তার নাম ডবল ক্রাউন। রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' ডবল ডিমাই কাগজে ছাপা। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' রয়্যাল কাগজে ছাপা। এই তিন সাইজের কাগজের মাপগুলো যদি মুখস্থ করে ফেলতে পারো খুব ভালো হয়।

ডবল ক্রাউন = ২০″ × ৩০″

ডবল ডিমাই = ২২½″ × ৩৫″

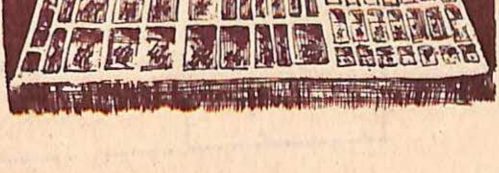
রয়্যাল = ২০″ × ২৫″

একটা ডবল ক্রাউন কাগজকে যদি সমান-সমান ভাঁজ করে ফেলো,

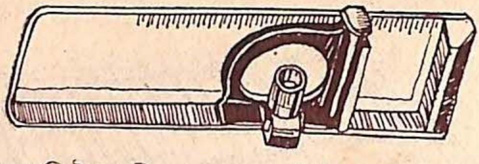




ওপরে : ইংরেজী টাইপ-কেস, অর্থাৎ টাইপ রাখবার কাঠের ডালা। লক্ষ্য করলেই নজর হবে, বাঁ দিকের সব খোপগুলো সমান নয়। ঐ খোপগুলোতে থাকে ছোটো হাতের টাইপ। ডান দিকের সমান মাপের খোপগুলোতে থাকে বড়ো হাতের টাইপ। বাঁ দিকের ছবিটা একটা ইংরেজী টাইপের। টাইপটা কোন্ অক্ষরের ? নিচে বাঁ দিকে : টাইপ-ভরতি কেস। নিচে ডান দিকে : কম্পোজিটর (বাঙালী নন তা তো পোশাকেই বোঝা যাচ্ছে) কেস থেকে টাইপ তুলে লাইন গাঁথছেন।







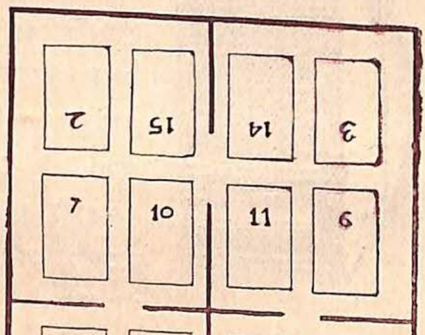
কম্পোজিটরের ষ্টিক : এর ওপর টাইপ সাজিয়ে লাইন গাঁথা হয়।

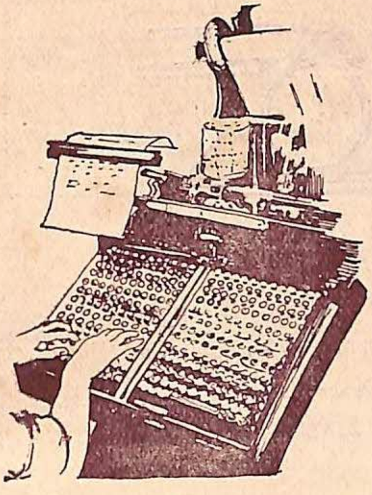


পুরনো আমলের ছাপার ব্যবস্থা : কালিমাখা একটা নুড়ি দিয়ে টাইপের ওপর কালি লাগিয়ে কাগজের ওপর ছাপ দেওয়া হতো।



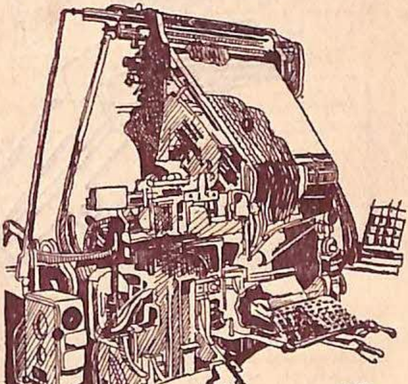
পাতাগুলোকে মেশিনে তোলবার আগের অবস্থা। একখানা মসৃণ লোহার পাতের ওপর পাতাগুলোকে এইভাবে উল্টে-পাল্টে সাজিয়ে তারপর চেজ-এ বেঁধে ফেলা হয়। পাতাগুলোকে এমন উলট-পালট করে সাজানো হয়েছে কেন? জবাবটা তুমিই ভেবে বার করো। আমি শুধু একটা কথা ধরিয়ে দিচ্ছি : কাগজের দু-পিঠেই ছাপা হবে, —একটা আস্ত কাগজের এ-পিঠে একবার ও-পিঠে একবার—দু বার ছাপ পড়বে।





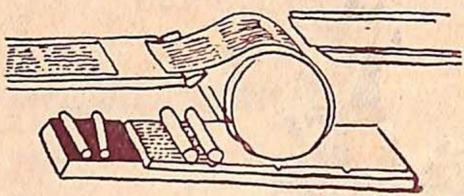
*

'মনোটাইপ' মেশিন। হরফ গাঁথার মেশিন। চাবি টিপলেই টাইপ তৈরি হয়ে লাইন গাঁথা হয়ে যাবে।

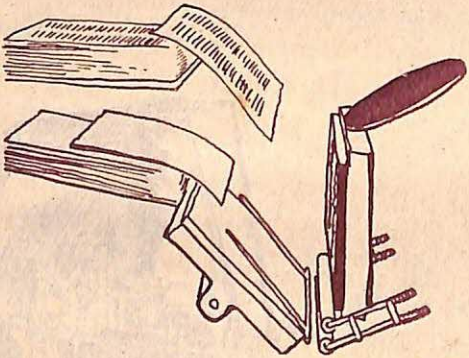


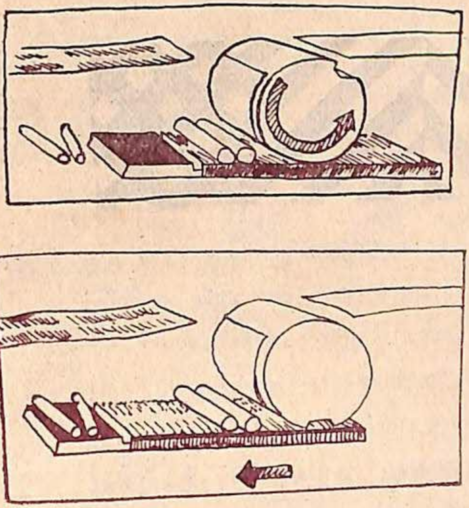
*

'লাইনোটাইপ' মেশিন। মনো-মেশিনের সঙ্গে লাইনো-মেশিনের তফাত এই যে, লাইনোয় গোটা লাইনটাই একটা আস্ত সিসের পাত; মনোতে প্রত্যেকটি টাইপ আলাদা এক-একটা টুকরো।

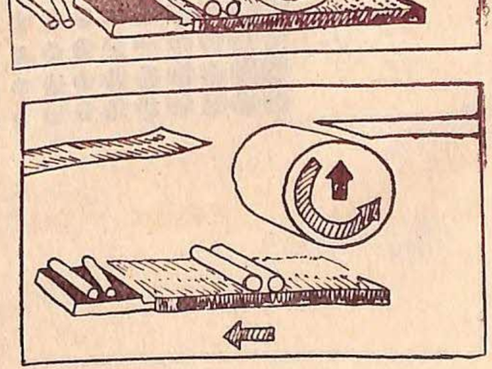


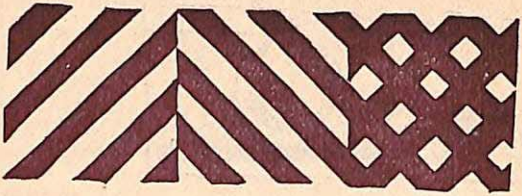
ছাপার আধুনিক মেশিন। ওপরে: সিলিণ্ডার মেশিন। এই মেশিনে বই ছাপা হয়। নিচে: প্ল্যাটেন মেশিন। এই মেশিনে ছোটো জিনিস—বিল, ক্যাশমেমো ইত্যাদি—ছাপা হয়।



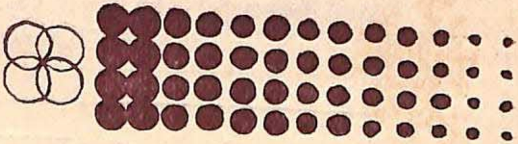


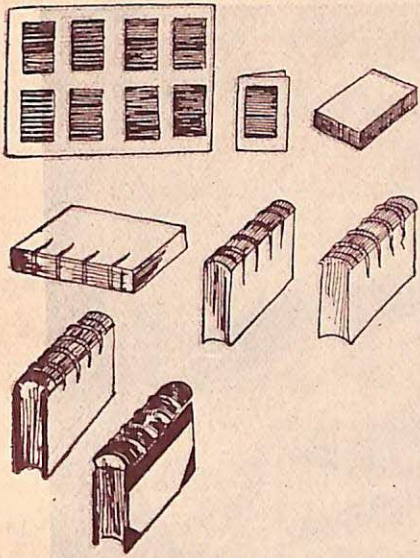
ওপরে : এক-পাক-ঘোরা সিলিণ্ডার মেশিন। এক পাক ঘুরে থেমে পড়ে, আবার ঘুরতে শুরু করে। নিচে : দু-পাক-ঘোরা সিলিণ্ডার মেশিন। থামে না, ছাপা শেষ করে একটু উঁচুতে উঠে ঘুরতে থাকে, আবার নেমে এসে ঘুরতে থাকে। এই ধরনের মেশিন চলবার সময়ে শব্দ প্রায় হয়ই না।





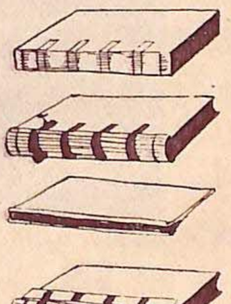
হাফটোন স্ক্রীন। ফোটো থেকে ব্লক তৈরি করতে হলে এই স্ক্রীন ব্যবহার করতে হয়। স্ক্রীন মানে একজোড়া কাচ। দুটো কাচে দু রকমের লাইন খোদাই করা থাকে। কাচজোড়াকে গায়ে গায়ে জুড়ে দিলেই চৌখুপি তৈরি হয়ে যায়। ওপরের ছবিটা দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ক্যামেরায় নেগেটিভ তোলবার সময় ফোটোর সামনে এই স্ক্রীন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার ফলে ফোটোটা ভেঙে ভেঙে ছোটো-বড়ো অসংখ্য ফুটকির সমষ্টিতে পরিণত হয়। ফোটোর যে অংশ কালো, সেখানে ফুটকিগুলো বড়ো-বড়ো, গায়ে-গায়ে লেগে থাকে, যে অংশ সাদা সেখানে ফুটকিগুলো ছোটো-ছোটো, আর ফাঁকা-ফাঁকা। নিচের ছবিটা দেখলেই স্পষ্ট ধারণা হবে।

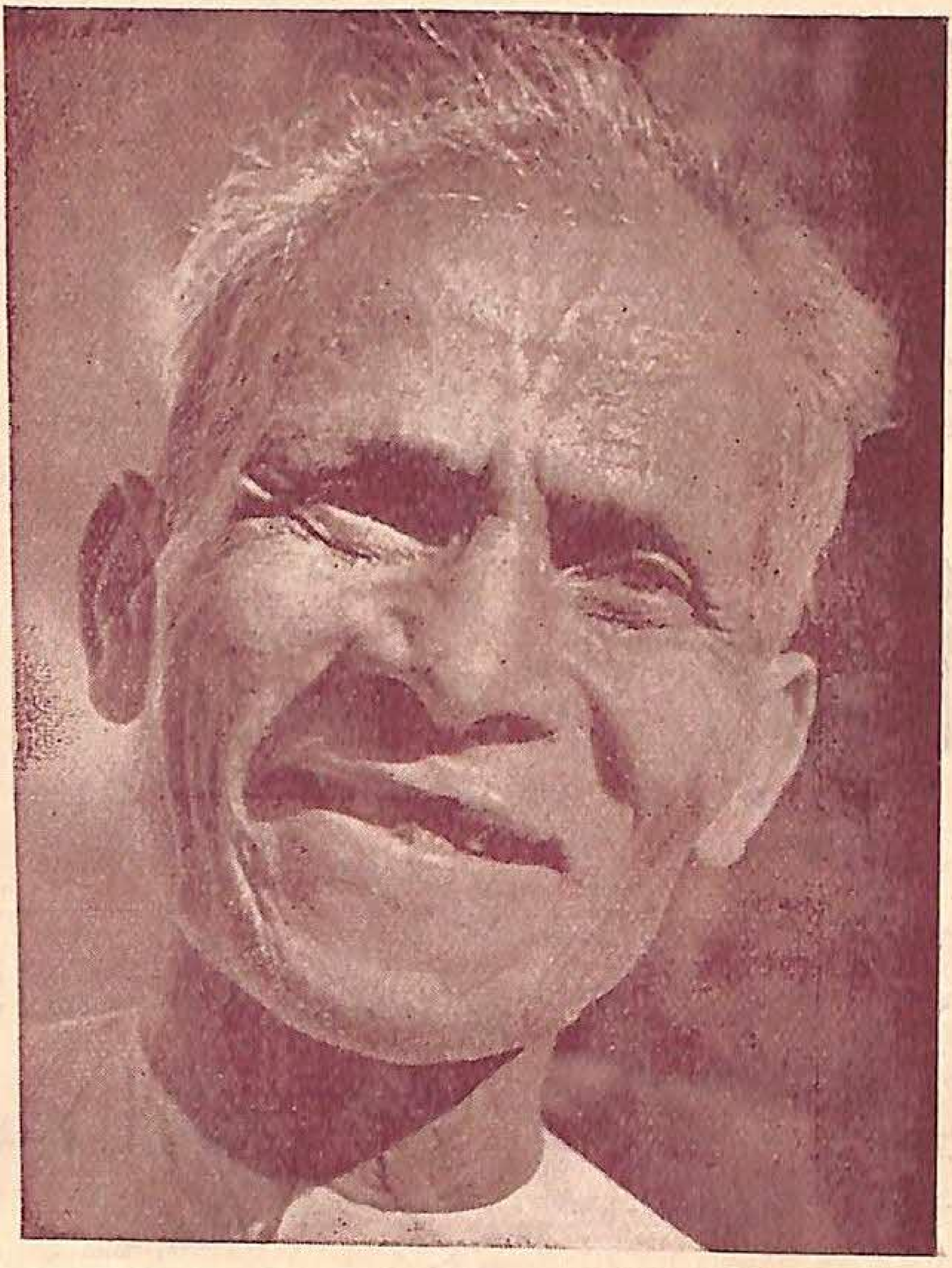




বই বাঁধাইয়ের কারিগরি। ছাপা আস্ত কাগজগুলোকে প্রথমে কাটাই মেশিনে চাপিয়ে দু-আধখানা করে নিতে হয়। কেন ? আমি বলবো না, নিজেই ভেবে জবাব বার করো। তারপর কাটা কাগজগুলোকে ভেঁজে-ভেঁজে বইয়ের পাতার মাপে আনতে হবে।

তারপর ফর্মাগুলোকে পরের পর ওপর নিচ করে সাজানো হয় : দপ্তরিরা যাকে বলেন 'মিসিল তোলা'। মিসিল তোলার পর সেলাই। তারপর মলাট লাগিয়ে দিলেই বই। মলাট নানা রকমের হয়, তার নানা রকম কারিগরি। মোটা-মোটা বইয়ের 'পুট'টা গোল করে তৈরি করা হয়, যাতে পাতাগুলো পুরো খুলে যায়। 'পুট' তৈরির রকমারি কারিগরি।





চট্টগ্রামের প্রবীণ কবিয়াল রমেশ শীলের ছবি। একটা আতস কাচ নিয়ে ছবিটাকে লক্ষ্য করলে হাফটোন ব্লকের ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

কী মাপ পাবে ? ১৫″ × ২০″

তাকে ভাঁজলে ? ১০″ × ১৫″

আবার ভাঁজলে ? ৭½″ × ১০″

আবার ভাঁজলে ? ৫″ × ৭½″

এবার স্কেল নিয়ে 'জানবার কথা'র ভেতরের যে-কোনো একটা পাতা মেপে নেবে ? মোটামুটি ৫″ × ৭½″ মাপ পাচ্ছো তো ? ছদিকেই একটু-একটু কম হচ্ছে। তার কারণ দপ্তরি বই বাঁধাই করবার সময়ে বইয়ের বাইরের ধার তিনটে সমান করবার জন্যে বইটাকে একটু ছেঁটে দিয়েছেন।

এখন, আলোচ্য প্রশ্নটায় এসো। গোটা কাগজটাকে ভাঁজ খুলে-খুলে একেবারে আভাঁজা মাপে যদি নিয়ে আসো, একই মাপের কটা পাতা পাবে ? গুনে দেখো—১৬টা।

তা হলে কী বোঝা গেলো ? ডবল ক্রাউন কাগজকে চারবার ভাঁজ করলে ৫″ × ৭½″ মাপের ১৬টা পাতা পাই ; তিন বার ভাঁজ করলে ৭½″ × ১০″ মাপের ৮টা পাতা পাই ; ছু বার ভাঁজ করলে ১০″ × ১৫″ মাপের ৪টা পাতা পাই ; এক ভাঁজ করলে ১৫″ × ২০″ মাপের ২টি পাতা পাই। অর্থাৎ আস্ত কাগজের ভাঁজের ওপরই নির্ভর করছে পাতার মাপ কী হবে আর ক পাতায় একটা পুরো ফর্মা হবে।

এতোক্ষণে হরফ গাঁথা, ছাপা আর কাগজের মাপ সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা হলো। কয়েকটা নতুন কথা শেখা হয়েছে। একটু ঝালিয়ে নিলে কেমন হয় ? নতুন কথাগুলো হলো :

টাইপ, কেস, ষ্টিক, গ্যালি,—কম্পোজিটর। চেজ, ফর্মা, টাইপ-বেড, সিলিণ্ডার, রোলার, এক-পাক-ঘোরা সিলিণ্ডার মেশিন, দু-পাক-ঘোরা সিলিণ্ডার মেশিন, রোটারি মেশিন, প্ল্যাটেন মেশিন—মেশিনম্যান। ডবল ক্রাউন, ডবল ডিমাই, রয়্যাল—নানান মাপের কাগজ।

॥ ছবি ছাপা ॥

লেখক কাগজের ওপর লিখলেন, কম্পোজিটর হরফ গাঁথলেন, মেশিনম্যান ফর্মা ছাপলেন, দপ্তরি বাঁধাই করলেন—। দোকানে দোকানে বই পোঁছে গেলো।

শিল্পী ছবি আঁকলেন, তারপর? ছবির তো আর হরফ তৈরি হয় না—তা হলে?

ছবি গেলো—ব্লক তৈরির কারখানায়। সেই কারখানার প্রধান যন্ত্র হলো—ক্যামেরা।

যে ছবি বা নকশা ছাপতে হবে তার একটা ব্লক তৈরি করে নিতে হবে।

ব্লক মানে কী? ব্লক কীভাবে তৈরি হবে?

ছবি বা নকশাটাকে ক্যামেরার সামনে ধরলেই সেটার একটা ছাপ পড়ে। সেটাকে বলে লাইন নেগেটিভ। তারপর, রাসায়নিক-মাখানো একটা দস্তার পাতের ওপর নেগেটিভটাকে রেখে খুব জোরে চাপ দিতে হয়। তারপর, সবশুদ্ধু আলোর সামনে আনলেই, আলো আর রাসায়নিকের ক্রিয়ায় নেগেটিভের স্বচ্ছ অংশটা,—যেটার ভেতর দিয়ে আলো গেছে,—শক্ত হয়ে যায়,

আর গলে না। তারপর, দস্তার পাতটাকে আলাদা করে নিয়ে সমস্ত পাতটার ওপর এক রকমের কালি লাগিয়ে জলে ডুবিয়ে রাখতে রাখতে পাতটার আলো-না-যাওয়া অংশটা আস্তে আস্তে গলে যায়, ছবিটা শুধু ফুটে ওঠে। এইবার দস্তার পাতটাকে সমান মাপের একটুকরো কাঠের ওপর পেরেক ঠুকে আটকে দেওয়া হলেই ব্লক তৈরি হয়ে যাবে।

শিল্পী নিজের ঘরে বসে সরু-মোটা সোজা-বাঁকা লাইন জুড়ে জুড়ে যে ছবি বা নকশা আঁকলেন তাই ব্লক হয়ে ছাপা হয়ে তোমার আমার চোখের সামনে চলে এলো।

লাইনের ব্লককে বলে—লাইন ব্লক। কিন্তু সব ছবিই তো লাইনে হয় না। যেমন ধরো, ফোটো। ফোটোর মধ্যে লাইন কোথায়? ফোটোর মধ্যে আছে—'টোন'।

টোন কাকে বলে?

টোন মানে গাঢ়তা। ২৪ পাতার ছবিটা দেখো। একজন গুণী কবিয়ালের ফোটো এটা। নজর করে দেখো, ফোটোটার সব জায়গা সমান কালো নয়—সাদাকালোর তারতম্য রয়েছে। আবার, সব জায়গা সমান কালো নয়, কোথাও হালকা কালো কোথাও ভারি কালো। একটা জোরালো আতস কাচ দিয়ে যদি ছবিটাকে দেখো, দেখবে ছবিটার মধ্যে অজস্র ফুটাক রয়েছে।

এই ধরনের টোনওয়ালা ব্লককে বলে 'হাফটোন ব্লক'। হাফ-টোন ব্লক তৈরি করার সময়ে ফোটোটার সামনে একজোড়া কাচ লাগিয়ে দিতে হয়। দুটো কাচেই কালো রঙের লাইন খোদাই করা আছে।

এই রকম কাচ দুটোকে গায়ে গায়ে লাগালে, দুটোয় মিলে অনেকগুলো চৌখুপি তৈরি হয়ে যায়। একে বলে স্ক্রীন। স্ক্রীনটা ফোটোর বিভিন্ন অংশকে ভেঙে ভেঙে কতকগুলো ফুটকি তৈরি করে দেয়। ফোটোর যে-জায়গা বেশি কালো সেখানে ছোটো-ছোটো ফুটকি, যে-জায়গা বেশি সাদা সেখানে বড়ো-বড়ো ফুটকি।

এইভাবে একটা 'স্ক্রীন নেগেটিভ' তৈরি হলো। তারপর, সেই নেগেটিভকে একখানা তামার পাতের সঙ্গে জুড়ে, লাইন ব্লকের মতোই, তামার পাতের ওপর একটা ছাপ নেওয়া হলো। তারপর, সেই তামার পাতটাকে সমান মাপের কাঠে চড়িয়ে পেরেক ঠুকে কাঠের সঙ্গে এঁটে দিলেই হাফটোন ব্লক তৈরি হয়ে গেলো।

হাফটোন স্ক্রীন মিহি-মোটার হিসেবে পাঁচ-ছ রকমের হয়। খবরের কাগজে ৬৫ স্ক্রীন ব্যবহার করা হয়; যে-রকম কাগজে 'জানবার কথা'র ছবির পাতা ছাপা হয়েছে তাতে ৮০ বা ১০০ স্ক্রীন চলবে, আরো ভালো প্লেন কাগজে—আর্ট পেপারে—১০০ থেকে ২০০ স্ক্রীন পর্যন্ত ব্যবহার হতে পারবে।

কাগজে টাইপ আর ব্লকের ছাপ নিয়ে ফর্মা ছাপা হলো। এবার ছাপা ফর্মাগুলো দপ্তরির কারখানায় যাবে। সেখানে কাগজগুলোকে ভাঁজ করা হবে। তারপর ফর্মাগুলোকে পরের পর ওপর-নিচ করে সাজিয়ে ফেলা হবে। তারপর সেলাই করে, বোর্ডের মলাট লাগিয়ে, এক-একখানা বই তৈরি হয়ে যাবে।



শিল্পে শক্তির প্রয়োগ

মিশরের পিরামিডের কথা থেকে আলোচনা শুরু করা যাক। মরুভূমির মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে মানুষ কীভাবে এই বিরাট পিরামিডগুলি তৈরি করেছিলো, সে-কথা ভাবতে অবাক লাগে। পিরামিডগুলির মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড়ো সেটার নাম 'কিয়োপস্'। এটাতে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে সবশুদ্ধ ২৩ লক্ষ পাথরের টুকরো আছে। বড়ো টুকরো এক-একটা ওজনে

প্রায় ৩৫০ টন—প্রায় ২৭ মনে এক টন হয়। পুরো পিরামিডটায় যতো পাথর আছে তার সবগুলোর মোট ওজন প্রায় ৫৭½ লক্ষ টন, অর্থাৎ কিনা ১৫৩৪৩০০০০ মন। এই বিরাট ওজনের পাথর-গুলো টানাটানি করা কি সহজ কথা? নীল নদের ওপারের পাহাড় কেটে এই পাথরগুলিকে বহুত পথ টেনে আনতে হয়েছিলো। ঐতিহাসিকদের মতে প্রায় ১ লক্ষ ক্রীতদাস বছরে তিনমাস করে একটানা পরিশ্রম করে ২০ বছরে এই পিরামিডটা তৈরি করেছিলো। অমানুষিক পরিশ্রমে কতো ক্রীতদাস যে মরেছিলো ঐতিহাসিকরা তার কোনো হিসেব দেন নি। কাজের নমুনা দেখে বুঝতে পারা যায়, তাদের সংখ্যা খুব কম হবে না। কাজটা খুবই কৃতিত্বের সন্দেহ নেই, বিশেষ করে সে-যুগে। কিন্তু এ কথাও ভোলা চলবে না যে, আজ আমরা যন্ত্রের সাহায্যে এই ধরনের কাজ অল্প কয়েকজন লোকে মিলে কয়েক-দিনেই করে ফেলতে পারি আর আজ এ কাজ করতে লোকদের পরিশ্রমও হবে সেই তুলনায় খুবই সামান্য। একটি আধুনিক রেলগাড়ির এঞ্জিন প্রায় ১৫০০ টন ওজনের জিনিসপত্র নিয়ে, ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটতে পারে। এই এঞ্জিনটা চালাতে দুজন ড্রাইভার ও চার জন সহকর্মী হলেই চলবে। এক-একটা ইলেকট্রিক ক্রেন হাজার মন ওজন অবলীলাক্রমে পাঁচতলা বাড়ির ছাদের ওপরে তুলে দেয়! বিরাট জাহাজ, রেলগাড়ি, এরোপ্লেন, একশোতলা উঁচু প্রাসাদ, বড়ো বড়ো পুল, সমুদ্রের বাঁধ—আমরা আজ এই যে-সব তৈরি করছি তার তুলনায় মিশরের পিরামিড কিংবা রোমের জলনিকাশের বিখ্যাত

'অ্যাকোয়াডাক্‌ট্‌গুলি' খুবই সহজ কাজ। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার যুগে গ্রীসদেশে প্রতি দুজন লোক পিছু এক জন করে ক্রীতদাস ছিলো! এদের গায়ের জোরই ছিলো সে দেশের শিল্প-উৎপাদনের একমাত্র শক্তি ও সম্বল। এদের অমানুষিক পরিশ্রমের ওপর গড়ে উঠেছিলো দেশের শিল্পসম্ভার। আর আজ? ১৯৩৫ সালে এক আমেরিকাতেই ১২৩ কোটি অশ্বশক্তি বিভিন্ন কাজের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিলো। এই বিরাট শক্তির অর্থ কী জানো? আমেরিকার প্রত্যেকটি নারী, পুরুষ এবং শিশুর জন্যে প্রায় ৭০ জন ক্রীতদাস থাকলে যে-কাজ করানো যেতো, এই শক্তি দিয়ে সেই কাজ করানো সম্ভব। এই শক্তি উৎপাদন করা হয়েছে বাষ্প, পেট্রল এবং বিদ্যুতের সাহায্যে।

অশ্বশক্তি কাকে বলে? বাষ্প এঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন জেমস্ ওয়াট। তারপর কয়লার খাদ থেকে জল নিকেশ করার কাজটা শুরু করা হলো বাষ্প এঞ্জিন দিয়ে। জেমস্ ওয়াটের হিসেব অনুযায়ী একটা খুব ভালো ঘোড়া মিনিটে ৩৩,০০০ পাউণ্ড জল (প্রায় ৪১০½ মন) এক ফুট উঁচুতে তুলতে পারে। তাই, ওইটেই হলো একটা ঘোড়ার শক্তি। ফলে, এই কাজের জন্যে যে-পরিমাণ শক্তি লাগে তারই নাম দেওয়া হয় এক অশ্বশক্তি।

তুলনাটাতে একটা কথা বলা হয়নি। বিদ্যুৎ, পেট্রল কিংবা বাষ্পের শক্তি যে মানুষের পেশীর শক্তির চেয়ে পরিমাণে অনেকগুণ বেশি শুধু তা-ই নয়। এদের সাহায্যে এমন অনেক কাজ এতো

ভালোভাবে করা যেতে পারে, নিজের পেশীর শক্তি দিয়ে মানুষ সে ধরনের কাজ কোনোদিনই করে উঠতে পারতো না। প্রকৃতির শক্তিকে ব্যবহার করেই মানুষ আজ এই অসাধ্য সাধন করছে। আজকের দিনে একজন মেয়ে-শ্রমিক একটা স্পিনিং মেশিনে যে পরিমাণ সুতো কাটতে পারে মধ্যযুগে চরকাতে ৩০০ শ্রমিকও সেই সুতো কেটে উঠতে পারতো না। আধুনিক একটা কাগজের কলে যে ক'জন শ্রমিক ১০,০০০ বর্গফুট কাগজ তৈরি করতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই-সংখ্যক শ্রমিক মিলে ১ বর্গফুট কাগজ কোনোরকমে তৈরি করতো।

আজকালকার শিল্পোৎপাদনে মানুষ যে বিভিন্ন শক্তি ব্যবহার করছে সেগুলির কথা জেনে নেওয়া যাক।

॥ জলচাকা ॥

রোম সাম্রাজ্যের সময় জলচাকার ব্যবহার জানা সত্ত্বেও তার প্রচলন হয়নি। এ সময় খাটুনির সবটুকুই ক্রীতদাস দিয়ে করানো হতো। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে জলচাকা দিয়ে গম পেষানোর কাজ শুরু হলো। পশমের কাপড়কে কুসির করা খুব পরিশ্রমের কাজ। কাপড়গুলি জলে ভিজিয়ে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে পিটতে হয়, তাতে কাপড়টা শক্ত হয়। এই কাজেও জল-চাকা লাগানো হলো। ক্রমে কামারশালে হাপর টানা, হাতুড়ি পেটানো, খাদ থেকে জল নিকেশ করা, এমনকি লোহার কার-খানার রোলিং মিলের কাজটাও জলচাকা দিয়ে করানো হলো। দ্বাদশ শতাব্দীতে হাওয়ার চাকার ব্যবহার শুরু হয়। বাষ্প এঞ্জিন

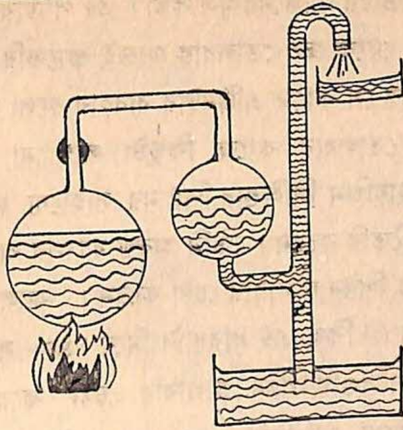
আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত জলচাকা, হাওয়াচাকা ছাড়া গোরু এবং ঘোড়ার সাহায্যে খাটুনির কাজ করিয়ে নেওয়া প্রচলিত হয়ে ছিলো। বিশেষ করে নবম শতাব্দীতে ঘোড়ার খুর তৈরি এবং লাগাম লাগানোর ভালো কায়দা আবিষ্কার হওয়াতে এদের শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হলো। এই তিন ধরনের শক্তির ব্যবহারে কাজের যে অনেক সুবিধা হলো সে কথা বলাই বাহুল্য। একটা ভালো ঘোড়া ঠিকমতো জুতলে ১০জন ক্রীতদাসের কাজ করতে পারে ; একটা জলচাকা কিংবা হাওয়াচাকা পারে ১০০ জনের।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের সময় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিলো। এই সময়ে শিল্প-উৎপাদনের উন্নতির জন্যে বিভিন্ন ধরনের শক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। যে কারখানা নদীর পাড়ে নয়, সেখানে জল-চাকা ব্যবহার করা চলে না ; বাতাসের জোর না থাকলে হাওয়ার চাকাও চলে না। এই সব অসুবিধা শিল্পোন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

লোহা ছাড়া যন্ত্র তৈরি হবে না। সেই লোহা পেতে হলে কয়লা চাই। লোহার খনিজের সঙ্গে কয়লা আর পাথুরে চুন মিশিয়ে লোহা তৈরি হয়। তাই লোহার টানে কয়লার চাহিদাও অনেকগুণ বেড়ে গেলো। বেশির ভাগ কয়লার খনি মাটির অনেক নিচে থাকে। মাটি খুঁড়ে কয়লার সীম পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই জল বেরিয়ে পড়ে। এই জল ছেঁচে বের করে না দিলে কয়লা তোলা সম্ভব হবে না। জলতোলা কাজটা ঘোড়া দিয়ে করানো হতো। তাতে সময় অনেক বেশি লাগে। খরচও অনেক হয়।

বাষ্পের শক্তি ব্যবহার করে জল তোলবার প্রথম পরিকল্পনা করেন শ্যাভেরি, ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাপটিষ্টা পোর্টা বাষ্পশক্তি দিয়ে জল তোলবার কল্পনা করেছিলেন, কিন্তু সে-কল্পনা কার্যকরী করতে পারেন নি। শ্যাভেরি যে যন্ত্রটা তৈরি করলেন সেটা অনেকটা পোর্টার কল্পনা অনুযায়ী। এ ছাড়া ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাঙ্কা বাষ্প দিয়ে টারবাইন চালানোর এক অবাস্তব পরিকল্পনা করেছিলেন। শ্যাভেরির যন্ত্রটাই সর্বপ্রথম ব্যবহারযোগ্য মেশিন।

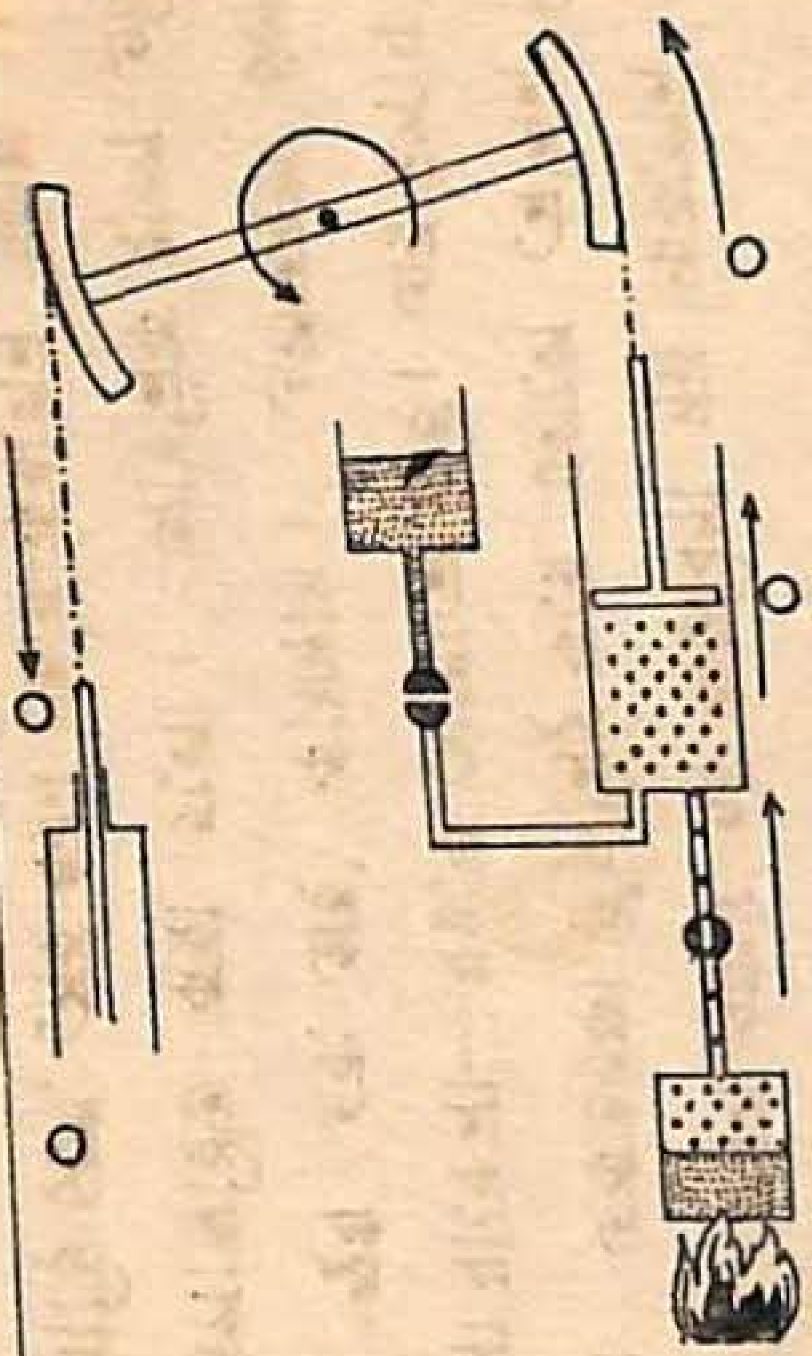
একটা সহজ পরীক্ষা করলে তোমরাও এর কায়দাটা বুঝতে পারবে। আট আউন্স কিংবা এক পাউণ্ড আন্দাজের ছোটো-মুখ-ওয়ালা বোতল জোগাড় করো। বোতলটা শক্ত কাঁচের হওয়া দরকার। বোতলের মুখের জন্যে একটা ভালো ছিপি লাগবে। একটা কেটলিতে খানিকটা জল গরম করে বাষ্প তৈরি করো। এই কেটলির নলের কাছে বোতলের মুখটা রেখে বাষ্প দিয়ে বোতলটাকে ভরে দাও। বোতলটাকে একটা তোয়ালে দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে নিলে হাতে গরম লাগবে না। তা ছাড়া যদি গরমের চোটে বোতল ফেটে যায় তাহলে হাত কাটবার সম্ভাবনা —তাই তোয়ালেটার দরকার নানান রকম। বোতলটাতে বাষ্প ভরে গেলেই, ছিপিটা ভালো করে এঁটে দাও। একটা বাটিতে খানিকটা জল রেখে, বোতলের ছিপিটা খুলে বাটির জলে মুখটা ডুবোলে দেখবে ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে বাষ্পটা জল হয়ে গিয়ে বোতলটাকে প্রায় খালি করে ফেলেছে। সেই জায়গাতে বাটির জলটা ঢুকে যাচ্ছে। এইভাবে বোতলের মধ্যে জল টেনে নেবার



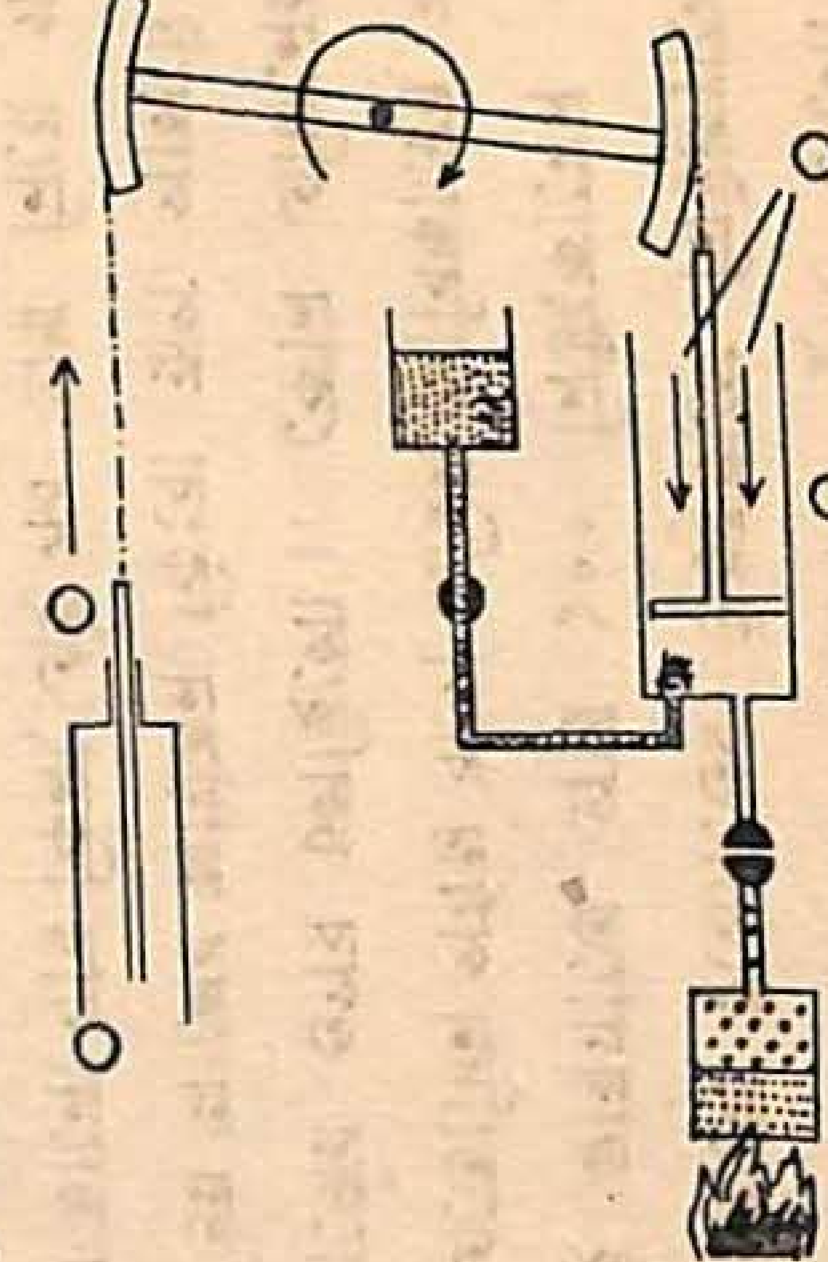
শ্যাভেরির এঞ্জিন। বাঁ দিকের পাত্রটায় জল ফুটিয়ে বাষ্প করা হচ্ছে। সে বাষ্প ডান দিকের পাত্রটার মধ্যে ঢুকে পাত্রর জলকে ঠেলে পাইপ দিয়ে ওপরে তুলে দিচ্ছে। ওপরে ওঠবার সময় ডানপাশের পাইপের ভেতরকার ভ্যাল্‌ভ দুটোর মধ্যে নিচেরটা বন্ধ হয়ে যাবে—জল আর নিচে নামতে পারবে না, শুধু ওপরেই উঠবে। এবার বাঁ দিকের পাইপের কালো ভ্যাল্‌ভটা বন্ধ করে দিয়ে বাষ্প যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন ডান দিকের পাত্রর বাষ্পটা জলের সংস্পর্শে এসে তরল হয়ে গিয়ে পাত্রটাকে প্রায় খালি করে দেবে। ফলে পাইপ দিয়ে জল টেনে আনবার ব্যবস্থা হবে। এবার কিন্তু ডান দিকের পাইপের ওপরের ভ্যালভ্‌টা বন্ধ হয়ে যাবে; কিন্তু নিচেরটা খুলে গিয়ে তলা থেকে জল টেনে আনবার সুবিধে করে দেবে। এইভাবে কয়েকবার চালালেই নিচের জলটা ওপরের ট্যাঙ্ক-এ চলে যাবে।

কায়দাটাই শ্যাভেরির এঞ্জিনের মূল কথা। ৩৫ পাতার ছবি দেখো।

যদিও খনি থেকে জল তোলবার জন্যেই শ্যাভেরি এঞ্জিন তৈরি করেছিলেন কিন্তু সে কাজে এঞ্জিনটার ব্যবহার হলো না। বসত-বাড়িতে জল তোলবার কাজে কিছুটা লাগানো হয়েছিলো। ১৬৮০ সালে হায়জিন সিলিণ্ডার-পিষ্টনের সাহায্যে জল তোলবার একটা মেশিন তৈরি করেন। তিনি অবশ্য বাষ্পের ব্যবহার করেন নি, বারুদ দিয়ে পিষ্টন চালাবার চেষ্টা করেন। ফলে তাঁর এঞ্জিন কার্যকরী হয়নি। কিন্তু এই ধারণাটা নিয়ে ১৬৯০ সালে প্যাপিন বাষ্প দিয়ে সিলিণ্ডার-পিষ্টন চালাবার চেষ্টা করেন। একটা সিলিণ্ডারের মধ্যে খানিকটা জল ভরে নিয়ে তার ওপর একটা পিষ্টন লাগানো হতো। সিলিণ্ডারের জলটাকে গরম করে বাষ্প তৈরি করলেই বাষ্পের চাপে পিষ্টনটা উঠে পড়তো। আগুনটা সরিয়ে নিলেই বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে জল তৈরি হতো। আয়তনে কমে যাবার দরুন পিষ্টনটা আবার নিচে নেমে আসতো। পিষ্টনটার উঁচু-নিচু হওয়াকে পাম্পের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাবে, এই ছিলো প্যাপিনের পরিকল্পনা। প্যাপিনের এঞ্জিনের অসুবিধা হচ্ছে, সিলিণ্ডারটাকে একবার আগুন লাগিয়ে গরম করতে হবে আবার পরমুহূর্তেই আগুন সরিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে। এভাবে এঞ্জিন চালানো যায় না। একবার গরম করলে ঠাণ্ডা করতে সময় লাগে, তেমনি ভালো করে ঠাণ্ডা করে নিলে আবার গরম করতে অনেক সময় চলে যাবে। এই অসুবিধা দূর করলেন নিউকোমেন,—শ্যাভেরির কায়দায় আলাদা পাত্রে বাষ্প তৈরি করে। নিউকোমেনের

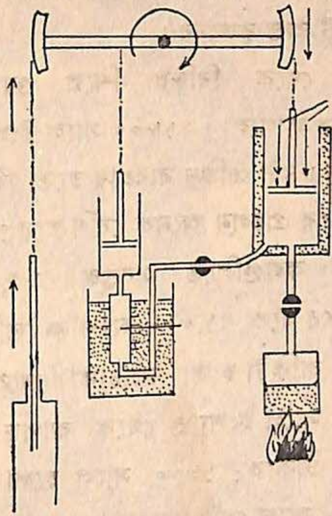


দুটো ছবিতেই নিউকোমেনের এঞ্জিনের কল-কাঠিটা আঁকা হয়েছে। বাঁ দিকের ছবি : জল গরম হয়ে বাষ্প হিসেবে সিলিণ্ডারের ভেতরে ঢুকছে ও তাই পিষ্টনটা তারই ঠেলায় ওপরে উঠে যাচ্ছে। পিষ্টনটার সঙ্গে লাগানো একটা রড্ ঘুরে গিয়ে জল তোলবার পাম্পের পিষ্টনটাকে নিচে নামিয়ে দিলো। ডান-দিকের ছবি : সিলিণ্ডারের ভেতরে খানিকটা জল ঢোকানো হয়েছে। ফলে বাষ্পটা ঠাণ্ডা হয়ে জল হয়ে গেলো, তাই পিষ্টনটা নিচে নেমে এলো। পিষ্টনের সঙ্গে লাগানো রডটা ঘুরে গিয়ে পাম্প দিয়ে জল টেনে তুললো। এইভাবে ওপর-নিচ করে পিষ্টনটা জল টেনে তুলছে। ছবিতে ভ্যাল্‌ভ্ বোঝাবার জন্যে কালো কালো গোল চিহ্ন আঁকা হয়েছে,—সেগুলোর মাঝখানটা চেরা। এদের সাহায্যে ব্যবস্থা করা হয় সিলিণ্ডারে জল ঢুকবে, না, বাষ্প ঢুকবে।



এঞ্জিনে কয়লার খরচ বেশি লাগলেও, খুবই ভালো কাজ হতো। ১৭৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডের উত্তরভাগে নিউক্যাসেল ও তার কাছাকাছি জায়গাতে প্রায় ১০০ নিউকোমেন এঞ্জিন চালু ছিলো। এতোদিন পর্যন্ত বাষ্প এঞ্জিন আবিষ্কারের কাজটা অনেকটা আন্দাজের ওপর চলছিলো। কোন এঞ্জিনের কী পরিমাণ শক্তি, ভিন্ন অংশের আয়তন কিংবা রূপ পালটে দিয়ে এঞ্জিনের শক্তি বাড়ানো যায় কিনা, এই সব প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন স্মেটন ১৭৬৯ সালে। স্মেটন পরীক্ষা করে দেখলেন, নিউকোমেনের এঞ্জিনের সিলিণ্ডারটা যদি ৬ ফুট লম্বা থাকে তাহলে সবচেয়ে বেশি কাজ করা যাবে। এরকম একটা এঞ্জিনের প্রায় ৭৬ অশ্বশক্তি হতে পারে। প্যাপিনের এঞ্জিনের একটা দোষ কিন্তু নিউকোমেনের এঞ্জিনেও রয়ে গেলো। একই সিলিণ্ডারে একবার গরম বাষ্প ঢোকানো হচ্ছে আবার সেটাতেই ঠাণ্ডা জল দিয়ে বাষ্পকে তরল করা হচ্ছে। বাষ্পকে ঠাণ্ডা করবার কাজটা যদি অন্য কোনো পাত্রে করা যেতো তাহলে বারবার ঠাণ্ডা সিলিণ্ডারকে গরম করার হাঙ্গামা চলে যেতো এবং বাষ্পের খরচ কমে যেতো।

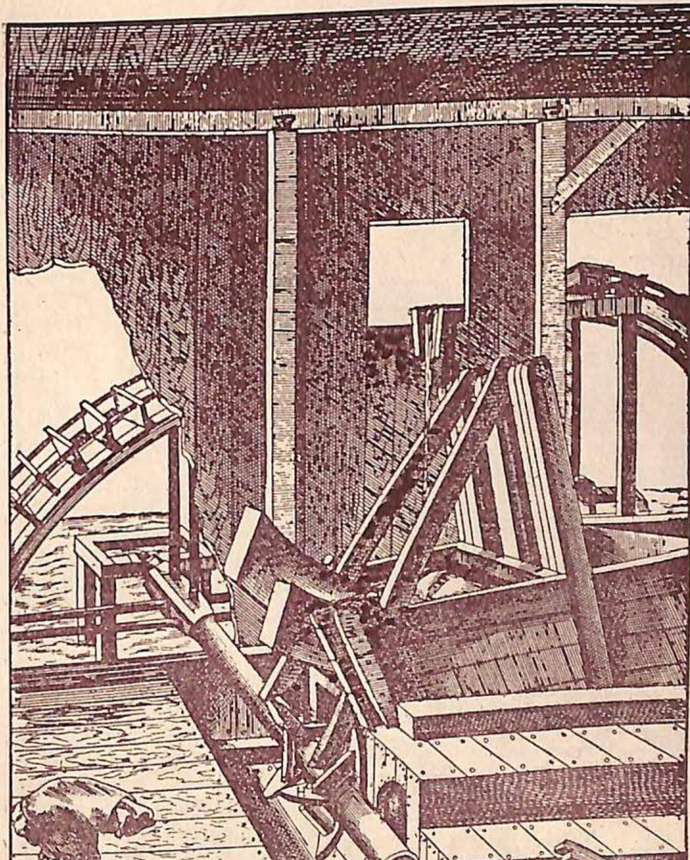
১৭৭৬ সালে জেমস ওয়াট এই অসুবিধা দূর করলেন তাঁর প্রথম এঞ্জিনে। একতরফা উঁচু-নিচু করে চললে মেশিন দিয়ে সব কাজ করানো যাবে না—যন্ত্রকে ঘোরানো চাই। এর উপায় বের করলেন ওয়াট 'সূর্য এবং গ্রহ' কায়দায়। একতরফা চলাকে ঘোরানোতে রূপান্তরিত করা হলো। আধুনিক বাষ্প এঞ্জিন, যা দিয়ে রেলগাড়ি চলে, সেই ধরন তৈরি করলেন উলফ ১৮০৪



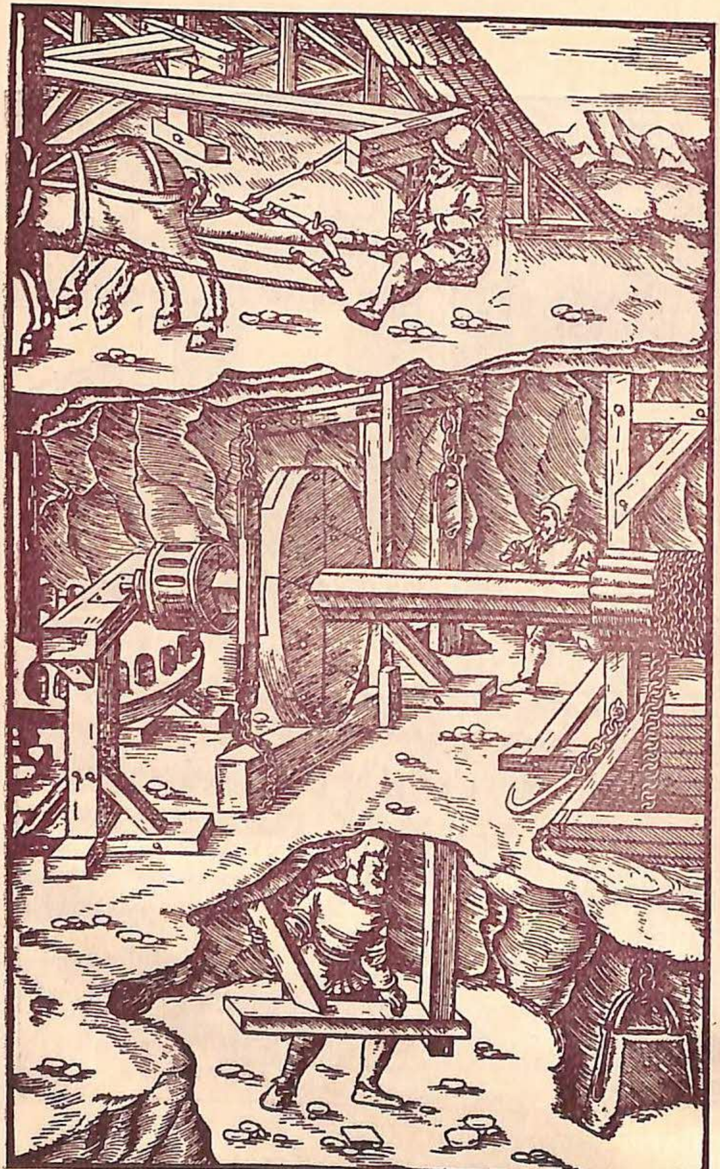
এটা ওয়াট-এর এঞ্জিনের ছবি। নিউকোমেনের এঞ্জিনের অসুবিধা ছিলো, সিলিণ্ডারটাকে একবার ঠাণ্ডা আর একবার গরম করতে হতো। ফলে অনেক তাপ নষ্ট হতো এবং কাজও ভালো হতো না। ওয়াট সেই অসুবিধা দূর করলেন। ছবিতে দেখো ওয়াট-এর এঞ্জিনের সুবিধেটা কী! ডানদিকের সিলিণ্ডারটা সব সময়েই গরম থাকবে। একে ভালো করে জড়িয়ে রাখা হয়েছে, যাতে তাপ না বেরিয়ে যায়। বাষ্প ঠাণ্ডা করে তরল করবার কাজটা চলেছে বাঁ দিকের আর একটা পাত্রে। এটা সবসময়েই ঠাণ্ডা থাকবে। কাজেই কোনোটাতেই তাপের অপব্যয় হবে না।

সালে ওয়াটের এঞ্জিন থেকে। এ ছাড়া আর এক ধরনের বাষ্প এঞ্জিন ব্যবহার হয়। সেগুলি টারবাইন নামে পরিচিত। এদের কার্যপদ্ধতিটা একটু অন্য রকমের।

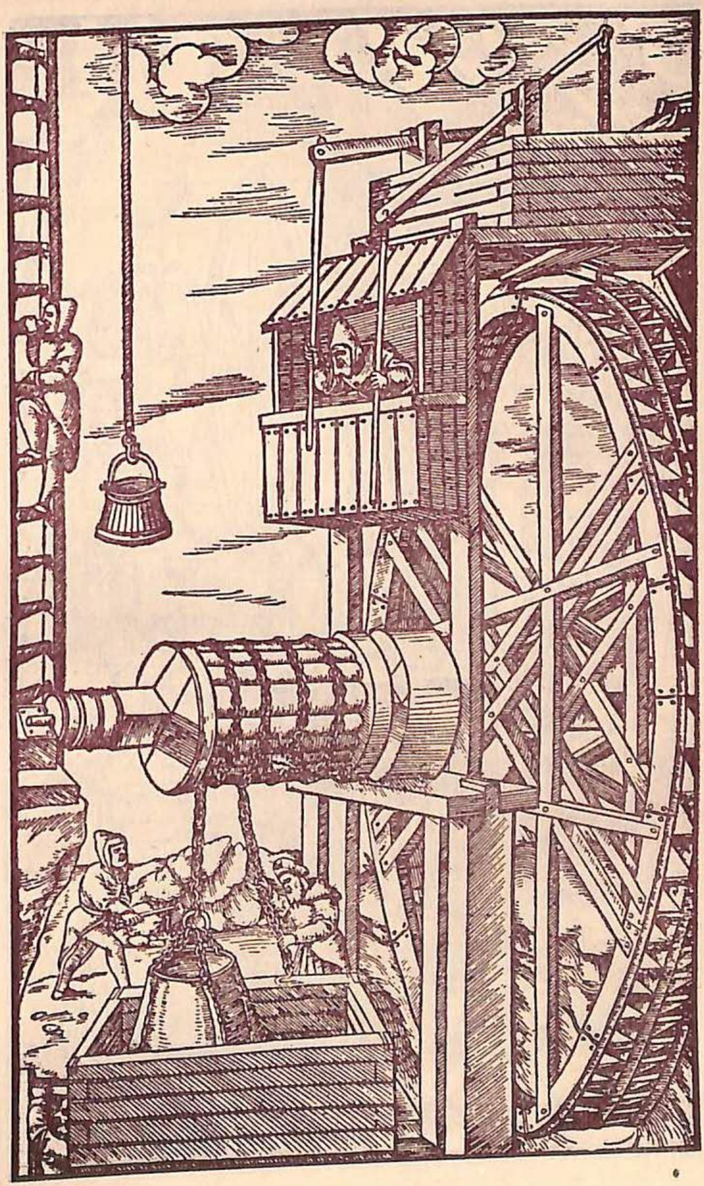
১৮০০ সাল থেকে বিভিন্ন শিল্পে ওয়াটের এঞ্জিনের ব্যবহার বেড়ে যেতে লাগলো। ১৮০০ সালে ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কলগুলিতে সবসুদ্ধ ৮৪টা এঞ্জিন ব্যবহার হতো কিন্তু তার পরের ৫০ বছরের মধ্যে এর প্রচলন অনেক বেশি হয়ে গেলো। ১৮৫০ সালে কাপড়ের কলগুলিতে সবশুদ্ধ ৮৩,০০০ অশ্বশক্তি ব্যবহার হতো। এর মধ্যে ৭১,০০০ অশ্বশক্তি তৈরি হতো ওয়াটের বাষ্প এঞ্জিন দিয়ে, বাকিটা হতো জলচাকা থেকে। এর ফলে কী হলো? ১৭০১ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে কাপড় রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৩,০২,২৮৯ টাকার; ১৮০০ সালে হলো ৭,০২,৮৪,৫১৩ টাকার আর ১৮৭০ সালে সেটা দাঁড়ালো ৯২,৮৪,১২,৪৮৫ টাকার। উৎপাদন বাড়বার নমুনাটা বুঝতে পারছো?



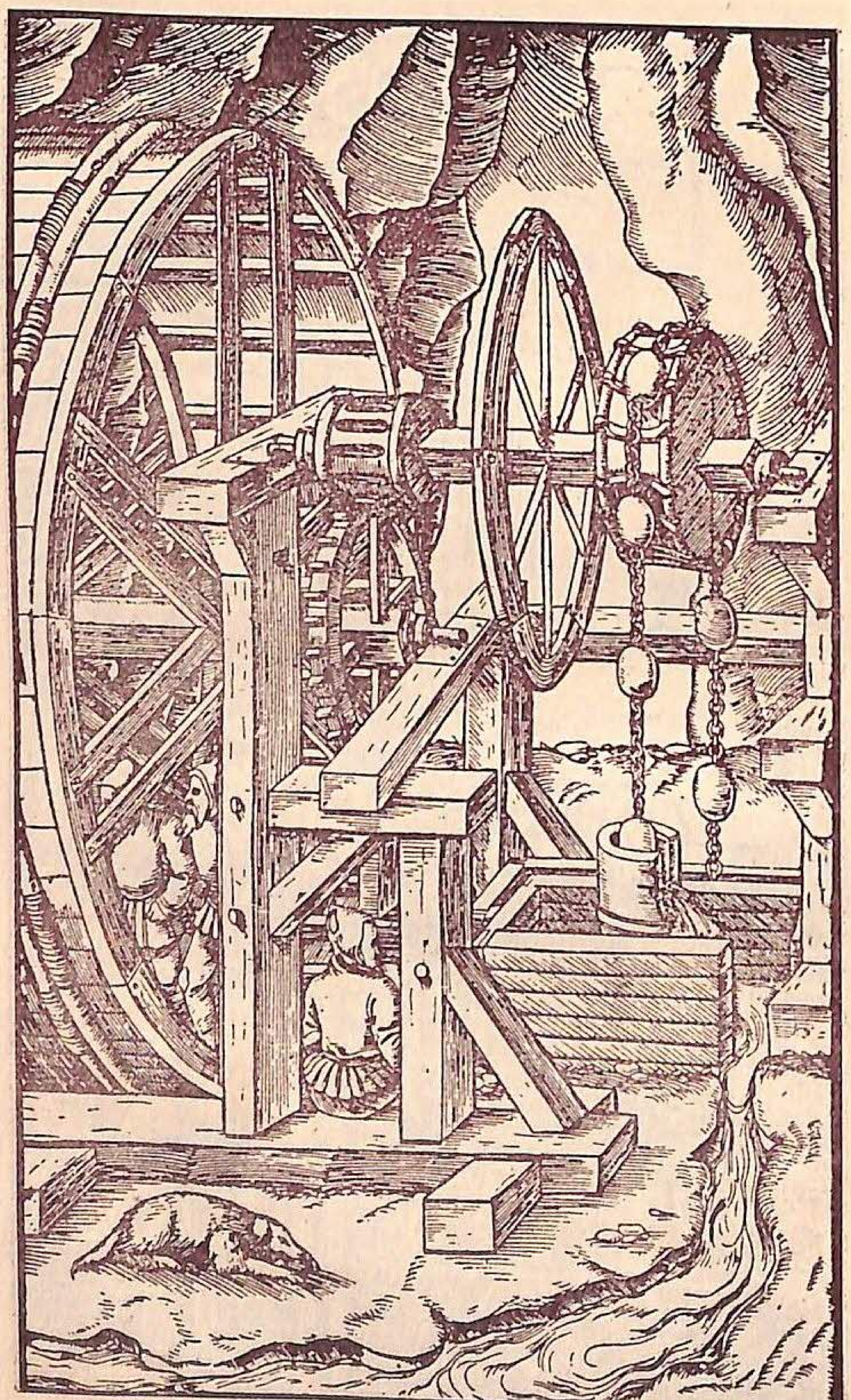
ষোড়শ শতকের জলশক্তি-চালিত 'ফুলিং মিল'



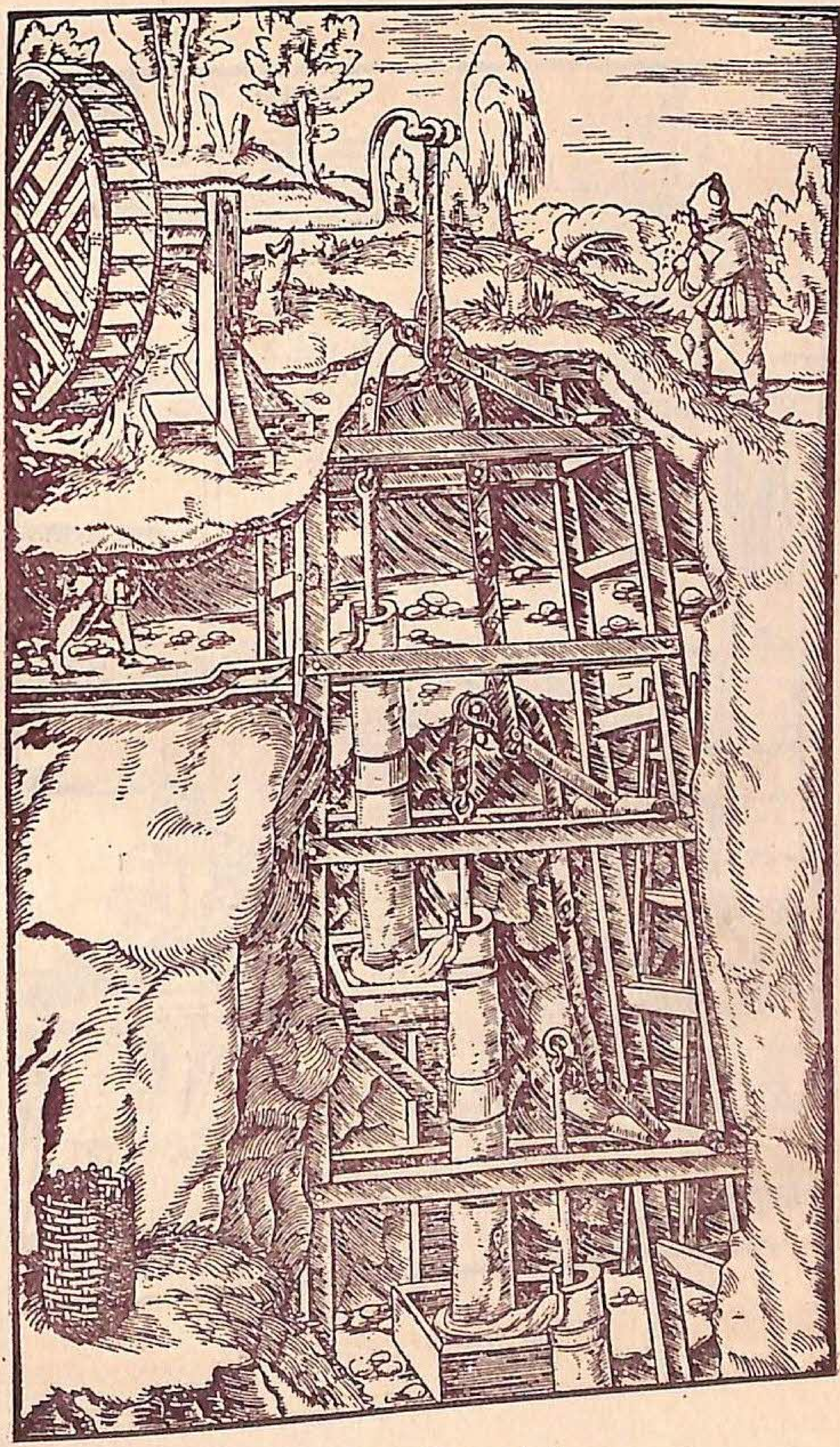
ঘোড়ার শক্তির সাহায্যে খনির মধ্যে থেকে জল ছেঁচবার ব্যবস্থা



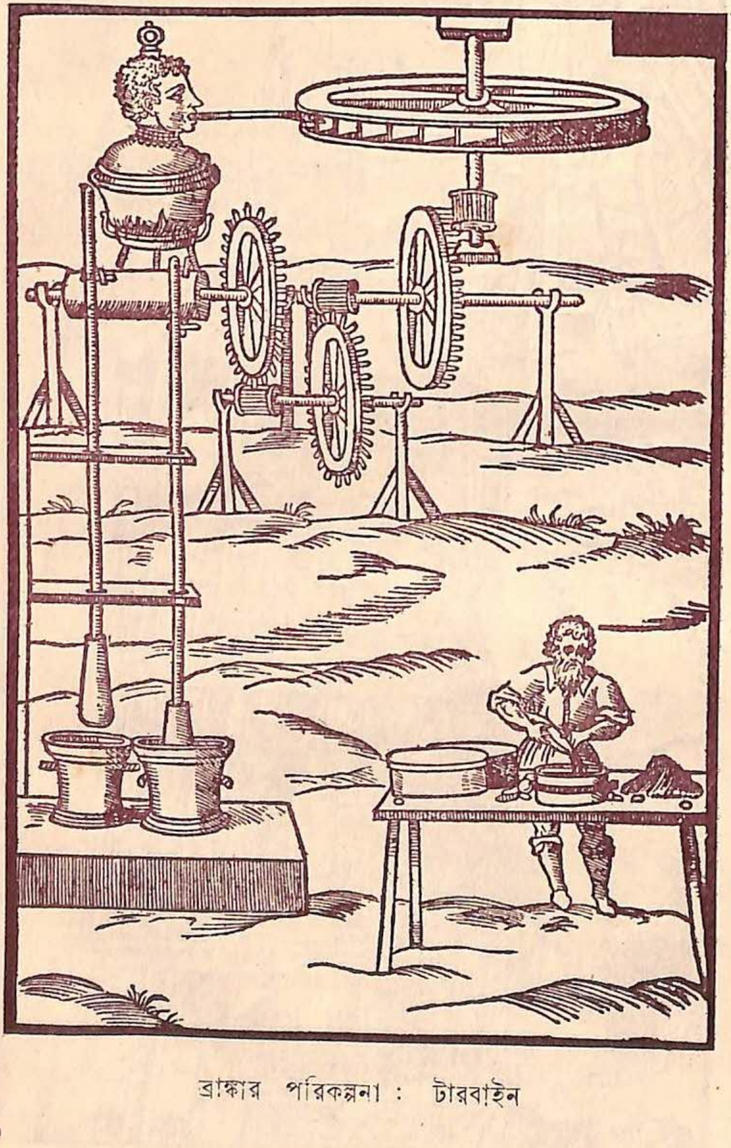
জলশক্তি-চালিত খনি থেকে জল ছেঁচার ব্যবস্থা



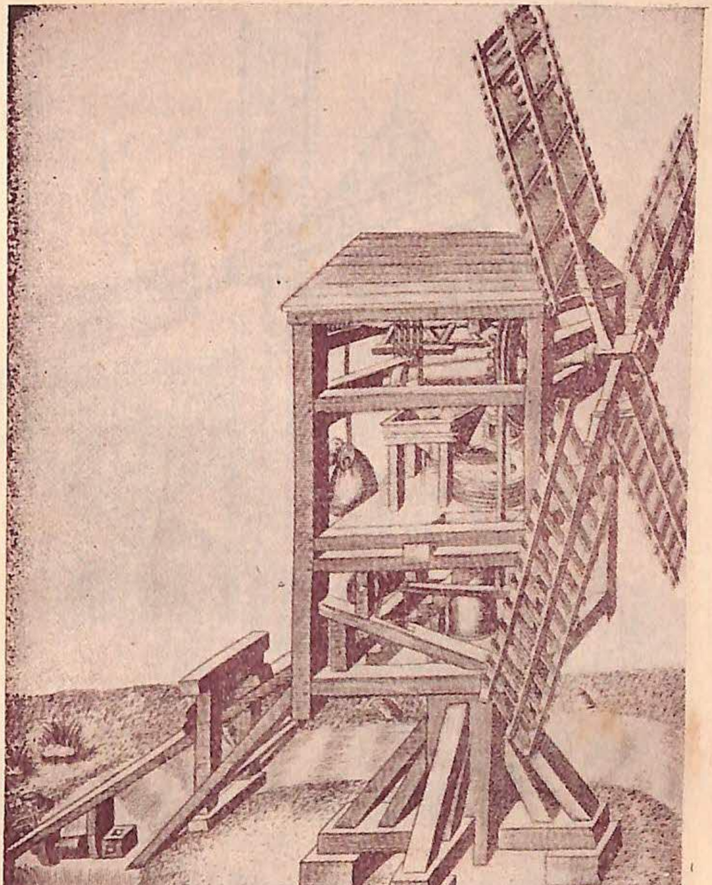
পায়ের শক্তিতে চালানো পাম্প



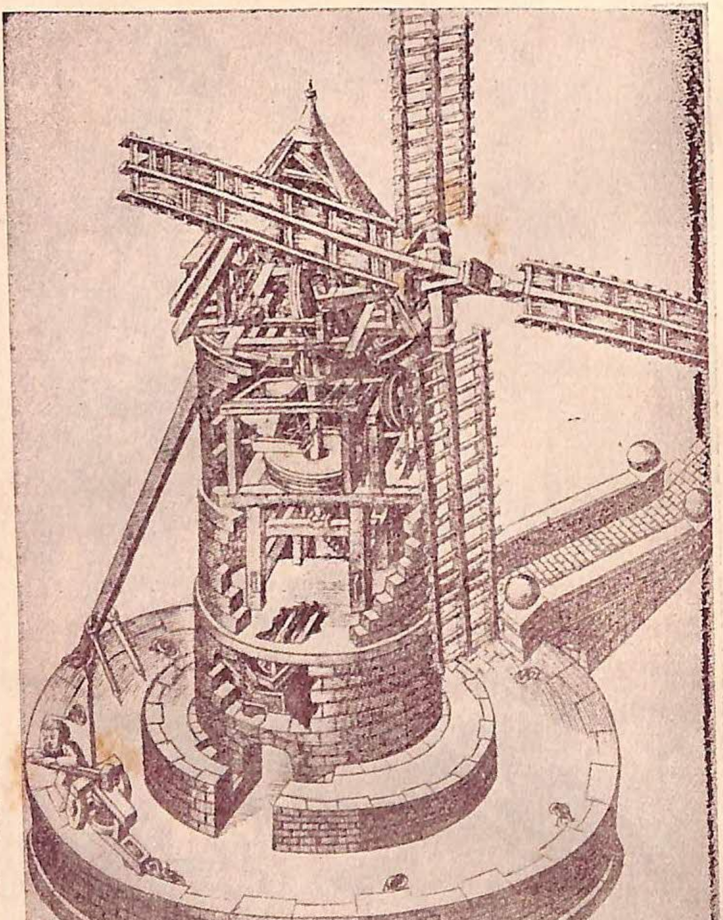
জলশক্তি-চালিত পাম্প



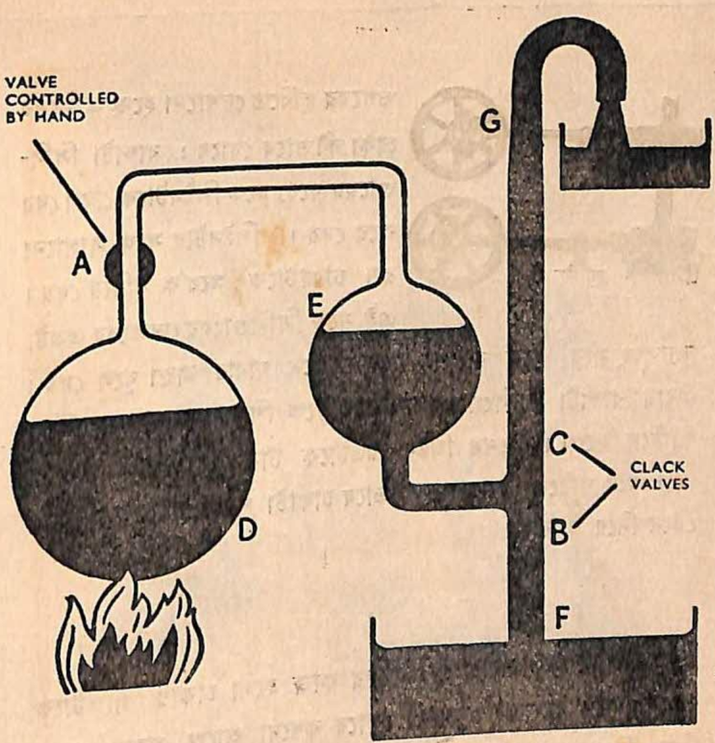
ব্রাঙ্কার পরিকল্পনা : টারবাইন



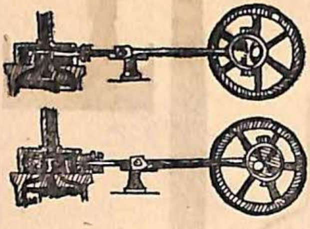
পোষ্ট উইণ্ড-মিল্



টারেট-উইণ্ড মিল

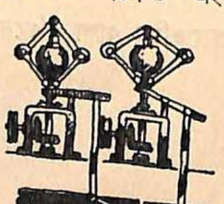


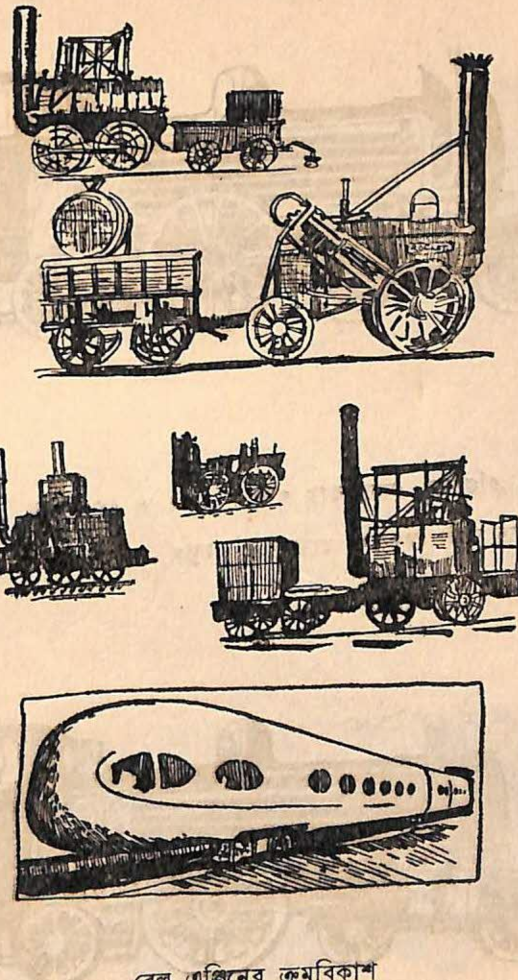
শ্যাভেরির বাষ্প এঞ্জিনের মূল কথাটা নক্‌শা কেটে বোঝানো হয়েছে।



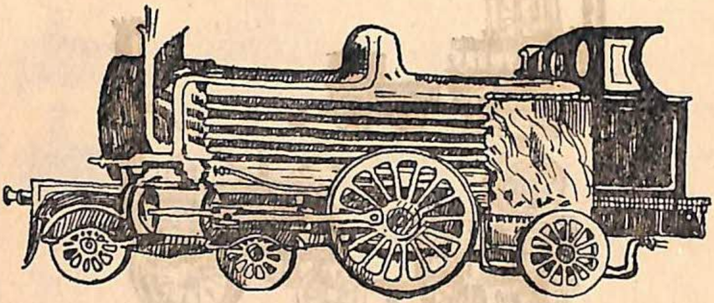
ওপরের ছবিতে দেখানো হচ্ছে এঞ্জিনের চাকা কীভাবে ঘোরে। বাষ্পটা সিলিণ্ডারের মধ্যে ঢুকে পিষ্টনটাকে ঠেলে বের করে দেয়। পিষ্টনটার সঙ্গে লাগানো রড চাকাটাকে অর্ধেক ঘুরিয়ে দেয়। এই সঙ্গে সিলিণ্ডারের ভেতরের একটা ভ্যাল্‌ভ্‌ সরে এসে বাষ্পের জন্যে পেছনে যাবার রাস্তা খুলে দেয়। এবার বাষ্পটা সিলিণ্ডারের ভেতরে ঢুকে পিষ্টনকে ভেতরের দিকে পাঠিয়ে দিলো। তখন পিষ্টন রডটাকে টান দিয়ে চাকার বাকি অর্ধেকটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে চাকাটা ঘুরতে ঘুরতে এঞ্জিনকে টেনে নিয়ে যাবে।

নিচের ছবিতে 'গভর্নার'। এদের কাজ হলো চাকার গতিটাকে সমান তালে রাখা। কখনো জোরে কখনো আস্তে ঘুরলে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে চলবে। সেইজন্যে এই গভর্নার লাগিয়ে ঘোরানোর গতিকে সহজ করা হয়। গ্রামোফোনের স্প্রিং-এর সঙ্গেও এই ধরনের গভর্নার লাগানো থাকে। উদ্দেশ্য সেখানেও রেকর্ডের নিচের চাকার ঘোরবার গতিটাকে সমান তালে রাখা।

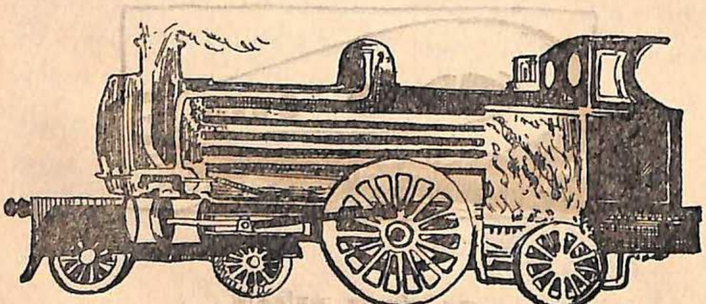


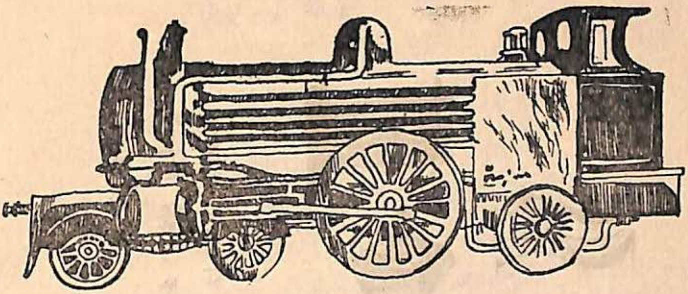


রেল এঞ্জিনের ক্রমবিকাশ

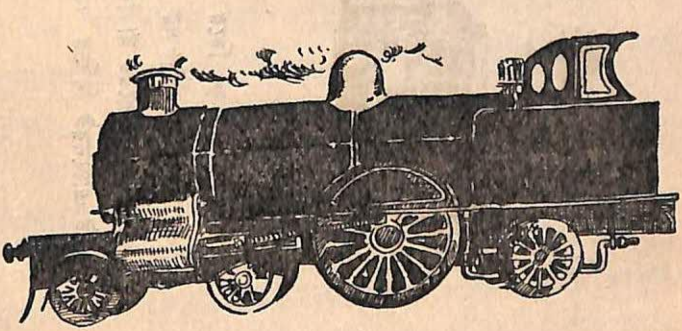


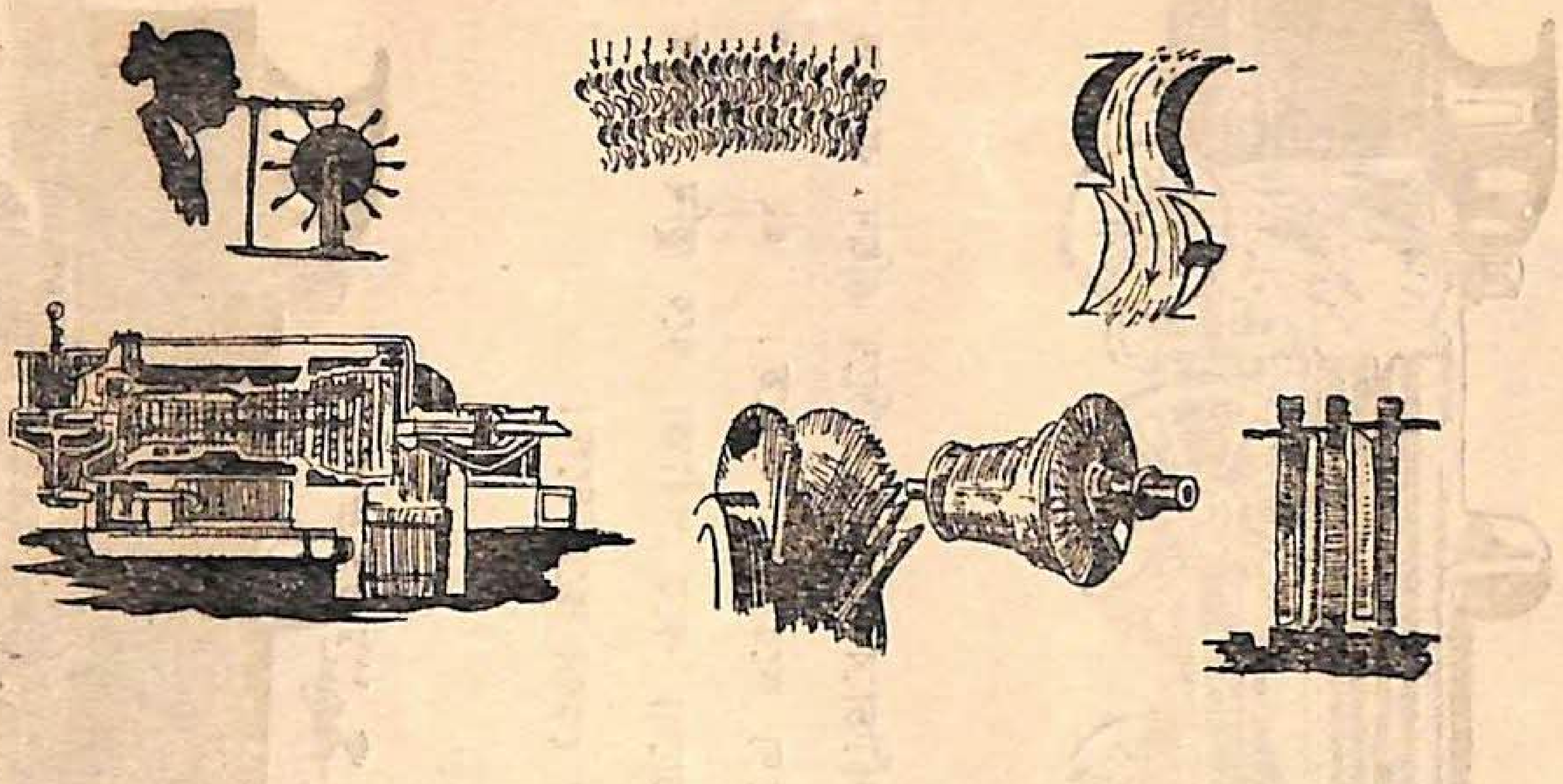
রেল এঞ্জিনের ভেতরকার খবর। ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠায় তিনটি ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে। চতুর্থ ছবিতে এঞ্জিনটা।



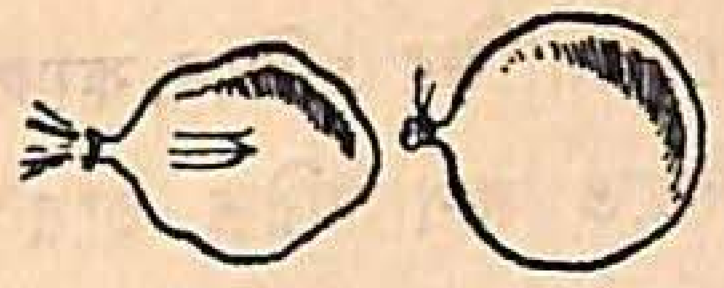


বাষ্পশক্তিকে মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়ে এঞ্জিন বানাতে শিখেছে সে-কথা বড়ো করে বলা হয়েছে। ৫২ ও ৫৩ পাতার ছবিগুলি ভালো করে পরীক্ষা করে তুমি এবার বলো : রেল এঞ্জিন কেমন করে চলে।





কাগজের ফুল ফুঁ দিয়ে ঘুরিয়েছো? ফুলটা ঘোরে হাওয়ার শক্তিতে। এই হলো টারবাইন্-এর মূল কথা। নিচের বাঁ দিকে একটি টারবাইন্ এঞ্জিন এবং ওপরের বাঁ দিকে টারবাইনের মূল রহস্য। বাকি ছবিগুলিতে এই এঞ্জিনেরই বিভিন্ন অংশ।



আধফোলা বেলুনটা তাপের চোটে ফুলে উঠেছে। আর একটু গরম লাগলেই ফেটে যাবে—তাহলে তাপের শক্তি কম নয়—বেলুনটা ফাটিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবেই তাপের শক্তি দিয়ে এঞ্জিন চালানো হয়।

শক্তি মানে কী?

বাষ্পের শক্তিটাকে মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে সেটা জানা গেলো। এবার দেখা যাক, বাষ্পের শক্তিটা কোথা থেকে এলো।

বাষ্প তো জলেরই একটা বিশেষ রূপ। তাহলে বাষ্প দিয়ে এঞ্জিন চলবে অথচ জল দিয়ে চলবে না কেন?

এর কারণ, বাষ্পের শক্তিটা আসছে আগুনের তাপ থেকে। জল থেকে বাষ্প তৈরি করতে যে-তাপটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই তাপটাই বাষ্পের ভেতরে থেকে তার শক্তির জোগান দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আগুনের তাপটাও শক্তিরই একটা ধরন।

এবার শক্তি সম্পর্কে ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক।

আমরা দেখেছি, রেলগাড়ির এঞ্জিনে, কয়লার আগুনের তাপের শক্তিটা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পিষ্টনটাকে ঠেলে দিলো—সঙ্গে সঙ্গে চাকাটা ঘুরে গেলো। কয়লা থেকে তাপ কী ভাবে তৈরি হলো? কয়লা কতোগুলি রাসায়নিক পদার্থের মিশেল। কয়লার রাসায়নিক পদার্থদের একটা বিশেষ গুণ হলো, একটু তাপ দিলেই তাদের ভেতর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় এবং সেই প্রক্রিয়া থেকে খুব বেশি পরিমাণ তাপের উদ্ভব হয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে তাপ! কথাটা বিশ্বাস যদি না করো তা হলে কালীপুজোর তুবড়ি কিংবা হাউই বাজির কথা ভেবে নাও—এগুলির মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই আগুন জ্বলে। তাহলে এঞ্জিনটা চলছে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে।

কিন্তু এখনও তোমার অনুসন্ধান শেষ হয় নি। কয়লার জন্ম কী করে হলো? গাছপালা থেকে? আর গাছ? তোমরা জানো সবুজ গাছপালা তাদের খাদ্য তৈরি করতে সূর্যের আলোর সাহায্য নেয়। বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে ষ্টার্চ এবং চিনি-জাতীয় জিনিস গাছপালা তৈরি করে সূর্যের আলোর সাহায্যে। এ থেকেই তাদের খাদ্য সরবরাহ হয়। একেই বলে ফোটো-সিনথেসিস। তাহলে কয়লার মধ্যে কোথা থেকে শক্তির জোগান হচ্ছে তাই খুজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সূর্যের আলোতে এসে পৌঁছনো গেলো। এবার যদি জিজ্ঞেস করো: সূর্যের আলো এবং তাপ কী ভাবে তৈরি হচ্ছে? তাহলেই, একটু মুশকিল। কীভাবে সূর্যের তাপ তৈরি হচ্ছে সে সম্পর্কে পণ্ডিতরা এখনও একমত হননি।

তবে যেটা মোটামুটি ঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে সেটা হলো : সূর্যের তাপ তৈরি হচ্ছে আণবিক শক্তি থেকে। এই আণবিক শক্তি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে।

তাহলে, এঞ্জিন চালানোর ব্যাপারে কতো ধরনের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলো : আলো, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, তাপ, যান্ত্রিক গতি। এ থেকে শক্তি সম্পর্কে একটা নিয়ম আমরা জানতে পারলাম—শক্তির রূপান্তর হয়। হাওয়ার চাকা, জল-চাকা, বাষ্প এঞ্জিন—এরা সবাই চলে এই নিয়মের জোরে। আগেকার বৈজ্ঞানিকরা ভাবতেন, আলো, তাপ, শব্দ—এরা সব সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। এদের কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই। চোখে লাগলে বুঝতেন আলো, কানে শুনলে শব্দ এবং হাত পুড়িয়ে দিলে তাপ। তাপকে চোখে দেখা যাবে না, কিংবা আলোকে কানে শোনা সম্ভব নয়—এই ছিলো তাঁদের ধারণা। চোখ, কান, এবং উত্তাপের অনুভূতির বাইরে যে সব পরিবর্তন ঘটতো সেই সব পরিবর্তনের জন্যে তাঁরা দায়ী করতেন 'ভগবানকে', রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছিলো তাঁদের কাছে আত্মার কীর্তি, জীবদেহের ভেতরের পরিবর্তনটা নির্ভর করতো ভগবানের ইচ্ছার ওপর। আজ আমরা আলোর পরিমাণ বুঝতে পারি ফটো-ইলেকট্রিক সেলের বিদ্যুৎ উৎপাদন দেখে, শব্দকে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুলে নিয়ে তাকে দেখতে পাই। শব্দকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে টেলিফোন তৈরি করেছি। এই রকম আরো কতো। এগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে শক্তির এই নিয়মটা জানা থাকাতে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন মনে

থেকে যাচ্ছে। রূপান্তরে কি শক্তির পরিমাণ কমে যাবে? পরীক্ষা করে দেখা গেলো, তা হয় না।

একটা পরীক্ষা করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

॥ 'ঘুমন্ত তাপ' বা 'লেটেন্ট হিট' ॥

একটা পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে গরম করতে শুরু করো। জলের মধ্যে একটা ভালো থার্মোমিটার ডুবিয়ে রাখো : জলটা যতো গরম হবে ততোই তো থার্মোমিটারে তাপমাত্রা তরতর করে উঠে যাবার কথা। কিন্তু, মজার ব্যাপার হলো, পরীক্ষা করতে করতে তুমি দেখবে যে গরম জলের তাপমাত্রা বেড়ে যাবার একটা সীমা রয়েছে : ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত পৌঁছবার পর তাপ-মাত্রা আর বাড়ছে না! কিছুক্ষণ জলটা ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অবস্থায় থাকবার পর বাষ্প হয়ে পাত্র ছেড়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে। এখন, তুমি যদি বাষ্পটাকে আর একটা পাত্রের মধ্যে ধরে ফেলে থার্মোমিটার দিয়ে তার তাপমাত্রা দেখো তাহলে দেখবে তার তাপমাত্রাও ওই ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

তাহলে এখানে একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সমস্যাটা কী? জলটা একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত গরম হবার পরও তো তুমি সেটাকে আগুনের ওপরে বসিয়ে রেখেছো। অর্থাৎ আগু-নের তাপ জলের মধ্যে আগেও যেভাবে যাচ্ছিলো এখনো সেই ভাবেই যাচ্ছে। আর যদি তাই হয় তাহলে জলের তাপমাত্রাটা তো ক্রমাগতই বেড়ে যাবার কথা। একটা সীমার পর তা আর বাড়ছে না কেন? যে বাড়তি তাপ দেওয়া হচ্ছে সেটা

নিশ্চয়ই অন্য কোনো কিছুর মধ্যে গিয়ে জমছে। কিসের মধ্যে গিয়ে জমছে? ওই বাষ্পের মধ্যে। কিন্তু বাষ্পের তাপমাত্রাও তো থার্মোমিটার দিয়ে দেখলে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড! তবুও তাই-ই। কিন্তু বাষ্পের মধ্যে তাপটা গিয়ে জমলেও আমরা স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না। কেননা, তাপটা বাষ্পের মধ্যে যাওয়া সত্ত্বেও যেন ঘুমিয়ে থাকছে, জেগে ওঠে নি। আর জেগে ওঠে নি বলেই তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

তাহলে, তাপ মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অবস্থাতেও থাকে। বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় একে বলে 'লেটেন্ট হিট'।

'লেটেন্ট হিট'-এর আরো দু-একটা নমুনা দেখো।

একটা পাত্রে বরফ রেখে পাত্রটাকে আগুনে বসালাম। বরফ গলে জল হয়ে যাবে। কিন্তু জল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা গরম হবে না—একবারে প্রথম অবস্থায় সে-জলের তাপমাত্রাও বরফের মতোই শূন্য ডিগ্রি। তাহলে, কী করলাম? শূন্য ডিগ্রির বরফ গলিয়ে শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রার জল করলাম। দুয়েরই তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি—সেদিক থেকে কোনো তফাত নেই। অথচ, বরফ গলিয়ে জল করবার জন্যে তো খানিকটা তাপ দিতে হলো। এই তাপটা গেলো কোথায়? ওই জলের মধ্যেই গেলো। কিন্তু তবুও থার্মোমিটার লাগিয়ে তার কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা, শূন্য ডিগ্রি জলের মধ্যে গেলেও তাপটা রইলো ঘুমন্ত বা 'লেটেন্ট' অবস্থায়।

বৈজ্ঞানিকেরা তাপের পরিমাণ মাপতে শিখেছেন—এমন কি

ওই ঘুমন্ত তাপেরও। কিন্তু ঘুমন্ত তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁরা যে-সব হিসেব-নিকেশ দিচ্ছেন তা বলবার আগে তাপের পরিমাণ বলতে ঠিক কী বোঝায় সে-কথা জানা দরকার।

॥ তাপের পরিমাণ আর ক্যালোরির হিসেব ॥

তাপের আঁচ আর তাপের পরিমাণ—ছুয়ের মধ্যে তফাত করবার চেষ্টা করো। ধরো, একটা উনুনে খুব গনগনে আগুন রয়েছে, আর একটায় চোঁয়া আগুন। ছুটো উনুনের ওপরেই এক সের করে ছুধ জ্বাল দিতে বসলাম। প্রথম উনুনটায় ছুধ ফুটে উঠলো চটপট, দ্বিতীয়টায় ছুধ ফুটতে অনেক বেশি সময় লাগলো। কেন তফাত হলো? কেননা, এক সের ছুধকে ফুটন্ত গরম করে তোলবার জন্যে বাঁধাধরা পরিমাণ তাপ লাগে—প্রথম উনুনটা এই তাপ জুগিয়েছে চটপট, দ্বিতীয় উনুনটা এই তাপ জোগাতে অনেক বেশি সময় নিলো। তাহলে কিন্তু মানতেই হবে যে একদিক থেকে ছুটো উনুনের মধ্যে মিলও রয়েছে: ছুধ ফোটাবার জন্যে যতোখানি পরিমাণ তাপ দরকার ছুটো উনুনই তার জোগান দিয়েছে—কেবল প্রথম উনুন সে-তাপের জোগান দিয়েছে চটপট করে, দ্বিতীয় উনুন ধিকিধিকি করে। যেমন ধরো, তুমি আর আমি ছুজনেই পাঁচ টাকা করে পকেটে নিয়ে বাজার করতে গেলাম, তুমি হয়তো খুব তাড়াতাড়ি টাকাটা খরচ করে ফেললে আর আমি হয়তো খুব টিপে-টিপে টাকাটা খরচ করলাম। কী পরিমাণ টাকা আমরা খরচ করলাম? হুবহু সমান। তেমনি, ছুধ ফোটাবার জন্যে ছুটো উনুনই হুবহু সমান পরিমাণ তাপ খরচ

করলো—কেবল প্রথম উনুনটা করলো চটপট, দ্বিতীয়টা চুঁইয়ে চুঁইয়ে।

অথচ দুটো উনুনের মধ্যে থেকে যে-তাপ পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে আঁচের তফাত দারুণ : একটার আঁচ গনগনে, আর একটার আঁচ চোঁয়ানো। থার্মোমিটার দিয়ে তাপের ঠিক কোন খবরটা পাই? এই আঁচের খবর। অমুক ডিগ্রি, তমুক ডিগ্রি। কিন্তু ঠিক কী পরিমাণ তাপ পাওয়া যাচ্ছে সে-খবর থার্মোমিটার বলে দিতে পারে না। দুটো উনুন একই পরিমাণ তাপ দিয়ে দুধ ফোটালো—এইদিক থেকে দুটো উনুনের মধ্যে যে-মিল রয়েছে সেই মিলটার কথা নিয়ে থার্মোমিটারের মাথাব্যথা নেই।

কিংবা ধরো, এক-সেরি এক চাঁই কয়লা। একে তুমি দাউ-দাউ করেও পোড়াতে পারো, আবার চুঁইয়ে চুঁইয়েও পোড়াতে পারো। যদি দাউদাউ করে পোড়াও তা হলে আঁচ হবে খুব জোর, যদি চুঁইয়ে চুঁইয়ে পোড়াও তাহলে আঁচ হবে কম। থার্মোমিটারের সাহায্যে এই আঁচের খবর পাওয়া যাবে,—সেটা তাপমাত্রার হিসেব। কিন্তু কথা হলো, দাউদাউ করে কয়লাটা জ্বালালেই কি সে-কয়লাতে ঢের বেশি জল ফোটানো যাবে, আর চুঁইয়ে চুঁইয়ে পোড়ালে ফোটানো যাবে কম জল? তা নয়। এক সের কয়লাকে দাউদাউ করেই জ্বালাও আর চুঁইয়ে চুঁইয়েই জ্বালাও—তাই দিয়ে যতোটা জল ফোটানো সম্ভব ঠিক ততোটা জলই ফোটানো যাবে। কমও নয়। বেশিও নয়। কেননা, ওই অতোটা জল ফোটাবার জন্যে একটা বাঁধাধরা পরিমাণ তাপ লাগবে আর কয়লার তালটার মধ্যে ঠিক সেই পরিমাণ তাপেরই

জোগান রয়েছে। যে-ভাবেই কয়লাটা পোড়াও না কেন, তার চেয়ে কম পরিমাণ বা বেশি পরিমাণ তাপ পাওয়া যাবে না।

তাহলে, আঁচ ছাড়াও তাপের আবার পরিমাণ আছে: এতোটা পরিমাণ তাপ, অতোটা পরিমাণ তাপ। এখন, তাপটা তো আর লোহা-লক্কড়ের মতো জিনিস নয় যে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে সের-বাটখারা দিয়ে তাকে মাপবো। তাপের পরিমাণ মাপবার জন্যে একরকম যন্ত্র তৈরি করা দরকার। বৈজ্ঞানিকেরা তা করেছেন। তাপের পরিমাণের হিসেবনিকেশ নিয়েও একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বৈজ্ঞানিকেরা সে-ব্যবস্থাও করেছেন। এক সের তাপ বা আধ সের তাপ তো আর বলা হবে না। তার বদলে বলা হবে, এক ক্যালোরি পরিমাণ তাপ, হাজার ক্যালোরি পরিমাণ তাপ।

এক ক্যালোরি বলতে ঠিক কতোটা পরিমাণ তাপ বোঝায়? এই হিসেবটা থেকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করো; ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রার এক গ্র্যাম (এক আউন্সের ১৬ ভাগের এক ভাগ হলো এক গ্র্যাম) জলকে ১০০ ডিগ্রি তাপমাত্রার এক গ্র্যাম বাষ্পে পরিণত করতে লাগবে ৫৩৭ ক্যালোরি পরিমাণ তাপ। আর এক গ্র্যাম শূন্য ডিগ্রির বরফকে এক গ্র্যাম শূন্য ডিগ্রির জলে পরিণত করতে লাগবে ৮০ ক্যালোরি তাপ। এখন এই হিসেব একেবারে বাঁধাধরা।

এইবার একটা কথা ভেবে দেখো। ছিলো ১০০ ডিগ্রির গরম জল, হয়ে গেলো ১০০ ডিগ্রির বাষ্প। থার্মোমিটার দিয়ে বাষ্পের তাপমাত্রা মাপতে গিয়ে দেখি, তফাত হয় নি। অথচ, তাপ তো লেগেছে। সেই তাপটার হলো কি? আগেই বলেছি, বাষ্পের মধ্যে তাপটা ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু আরো একটা ব্যাপার আছে নজর করবার মতো: বাষ্পের যে-শক্তি আছে সেটা গরম জলের মধ্যে ছিলো না। গরম জল এঞ্জিন চালাতে পারে না, বাষ্প পারে। তাহলে, বাষ্পের মধ্যে এই যে শক্তি দেখা দিলো এটা এলো কোথা থেকে? ওই তাপ থেকেই। বাষ্পর ওই ঘুমন্ত তাপটাই তার আসল শক্তি।

তার মানে? ছিলো তাপ, হয়ে গেলো বাষ্পের শক্তি। তাহলে মানতেই হবে, তাপও যা শক্তিও তাই—যেমন এক টাকাও যা আর ষোলো আনাও তাই। টাকা বদলালেই ষোলো আনা পেয়ে যাবো। তাপকে বদলালেই পেয়ে যাবো শক্তি। কিন্তু এক টাকা বদলে কি কখনো সতেরো আনা আর কখনো পনেরো আনা পাবার কথা? তা কেন হবে? এক টাকা বদলালে বরাবরই ষোলো আনা পাবো। তাপ আর শক্তির বেলাতেও মোটের ওপর একই রকম। অমুক পরিমাণ বা অতো ক্যালোরি তাপ বদলে তুমি তমুক পরিমাণ শক্তি পাবে—বরাবরই তা সমান। একেবারে বাঁধাধরা। কখনো কমবে না, কখনো বাড়বে না।

তাহলে ছুটো ব্যাপার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক হলো, তাপ বদলে শক্তি হয়। কিন্তু এই অদলবদলের দরুন পরিমাণের কমবেশি হয় না। অতো ক্যালোরি তাপ = অতো অশ্বশক্তি। পাইপয়সার এদিক ওদিক হবে না। কিংবা ব্যাপারটাকে আর একভাবেও বোঝবার চেষ্টা করা যায়। অনেক সময়, টাকা ভাঙাতে গেলে বাটা দিতে হয়। হয়তো দশ টাকা ভাঙাতে গিয়ে ছু-আনা বাটা লেগে গেলো—সেটা আর আমি পেলুম না। কিন্তু, সেদিক থেকে, প্রকৃতি যেন খুবই ভালো লোক। তুমি যখন তাপ বদলে শক্তি চাইবে তখন প্রকৃতি তোমার কাছ থেকে একটুও বাটা চাইবে না। তার মানে, তাপকে শক্তিতে রূপান্তরিত করবার সময় এতোটুক তাপও নষ্ট হয় না।

এখন তাপটা যে শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাই দেখেই আমরা বুঝতে পারছি, তাপটা শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয় : শক্তিই আগে ছিলো তাপরূপে, রূপ বদলে বাষ্পশক্তির চেহারা নিলো—তা যে সম্ভব হলো তার কারণ ওই বাষ্পশক্তি আর তাপ আসলে একই শক্তির ছু রকম রূপ।

তার মানে শক্তির রূপান্তর হয়। কিন্তু এই রূপান্তরের দরুন শক্তির ধ্বংসও হয় না, নতুন শক্তি সৃষ্টিও হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা এই নিয়মটির নাম দেন, শক্তির সংরক্ষণ-সংক্রান্ত নিয়ম বা ল অফ্ কন্‌সারভেশন্ অফ এনার্জি।

শক্তির রূপান্তর-সংক্রান্ত এই নিয়ম জানতে পারবার দরুন আমরা আজকে দারুণ ভালো যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারি। কয়লা পোড়ানোর তাপ দিয়ে আমরা এঞ্জিন চালাই, অর্থাৎ

কাজ করি। কিন্তু এঞ্জিনটা তৈরি ঠিক হয়েছে কি না তা জানবো কী করে? কী করে বুঝতে পারবো যে আমার তৈরি এঞ্জিনটা তাপের শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে, না, অযথা অনেক তাপ নষ্ট করে ফেলছে? এই তথ্য আমরা পেতে পারি যদি জানতে পারা যায় ঠিক কতোটা 'তাপে' কতোটা 'কাজ' দেওয়া সম্ভব। তাপ এবং কাজের সম্পর্কটা জানালেন জুল। এই জ্ঞান থেকেই আজ ভালো এঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। জুল দেখালেন নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ থেকে নির্দিষ্ট কাজ পাওয়া যাবে।

সমুদ্রজয়ের কাহিনী

বাষ্পশক্তিকে আয়ত্তে এনে জমির ওপর রেল-লাইন পেতে মানুষ এঞ্জিন হাঁকিয়ে দিলো। সে-এঞ্জিন একদিনে হাজার যাত্রীকে হাজার মাইল পথ পার করে দিলো!

কিন্তু নদী? মহানদী? সমুদ্র? মহাসমুদ্র? এর ওপর তো রেল-লাইন পাতা চলে না! হাঁকানো যায় না রেল-এঞ্জিন!

তা অবশ্য যায় না। কিন্তু বাষ্পশক্তিকে হাতের মুঠোয় আনতে পারবার পর মানুষ এমন কি মহাসমুদ্রে পাড়ি দেবার ব্যাপারটাও আজ প্রায় ছেলেখেলার সামিল করে তুলেছে!

সমুদ্র, মহাসমুদ্র,—পাড়ি দেবার চেষ্টাটা অবশ্য আজকের নয়। বহুদিন আগে থাকতেই মানুষ এ-চেষ্টা করেছে, পেরেছেও। কয়েক হাজার বছর আগে থাকতেই মানুষ তৈরি করেছে মস্ত বড়ো বড়ো নৌকো—সমুদ্রগামী নৌকো। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষ, চীন, মিশর, ফিনিসিয়া—নানান দেশের মানুষ সওদাগরি বোঝাই

করে পৃথিবীর এ-তল্লাট থেকে ও-তল্লাট পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। তবু সে-সব দিনের সঙ্গে আজকের দিনের একেবারে আকাশ-পাতাল তফাত!

বড়ো নৌকোই বলো আর জাহাজই বলো, কোনোটাই তো আর আপনি আপনি চলে না। সেগুলিকে চালাবার জন্যে শক্তি লাগে। আগেকার কালে এই শক্তির জোগানটা কোথা থেকে হতো? মানুষ যখন সবপ্রথম নদী পেরুবার জন্যে ডিঙি বানাতে শিখলো তখন তার নিজের গতরের শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তির সম্বল নেই। এই শক্তির সাহায্যেই দাঁড় টেনে টেনে নদী পেরুবার চেষ্টা। তাতে যে কী অমানুষিক পরিশ্রম লাগে তা আর বলবার কথা নয়। একটি ছোটো ডিঙিতে একজন যাত্রীকে একটি ছোটো নদী পার করাবার জন্যেই দুজন মাঝি হয়তো গলদঘর্ম হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মজা হলো, ওই অবস্থাতেই সে চুপটি করে পড়ে থাকে নি। ডিঙির বদলে ক্রমে সে নৌকো বানাতে শিখলো: সে-নৌকোয় হাল আছে, পাল আছে। হাল-পালের সুবিধেটা কী? হালের সাহায্যে নদীর স্রোতের শক্তিটাকেই নদী-পেরুবার কাজে লাগানো যায়, পালের সাহায্যে বাতাসের শক্তিটাকে কাজে লাগানো যায় নদী পার করে দেবার কাজে।

হালের উন্নতি হতে লাগলো। মানুষ শিখলো নদীর স্রোতকে আরো ভালো করে নিজের কাজে লাগাতে। পালের উন্নতি হতে লাগলো: শুরুর দিকে মাত্র একটা মাস্তুল, তাতে মাত্র একটা পাল। এ-অবস্থায় তুমি যে-মুখে যেতে চাইছো যদি তার উলটো দিক থেকে সেই দিকেই হাওয়া বইতে শুরু করে শুধুমাত্র তাহলেই

তোমার পক্ষে ওই হাওয়ার শক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব। কিন্তু একটা মাত্র মাস্তুলের বদলে যদি অনেকগুলো মাস্তুল হয় আর প্রতিটি মাস্তুলেই যদি অনেকগুলি করে পাল খাটাতে পারি? তাহলে আমি নিশ্চয়ই নানান মুখ থেকে আসা হাওয়ার শক্তিকে এই সব রকমারি পালের সাহায্যে কাজে লাগাতে পারবো।

হালের উন্নতি হলো। পালের উন্নতি হলো। কিন্তু তাই বলে, দাঁড় টানবার জন্যে মানুষের গতর খরচা করবার দরকারটা চুকে গেলো নাকি? নিশ্চয়ই নয়।

সে-কালের বড়ো বড়ো নৌকোর দাঁড় টানবার জন্যে কী পরিমাণ মানুষের শ্রম যে লাগতো তা ভাবতে গেলে বুক যেন হিম হয়ে যায়। পালে-পালে ক্রীতদাস ধরে এনে নৌকোর দাঁড়ির আসনে সারবন্দী করে বেঁধে রাখা হতো। আর রাত নেই, দিন নেই, মানুষগুলো যন্ত্রের মতো একঘেয়েভাবে শুধু দাঁড় টানছে আর দাঁড় টানছে!

মোটের ওপর এই রকমেরই অবস্থা চলেছিলো অনেকদিন পর্যন্ত। তার মানে, সব সময়েই যে ওইভাবে সারবন্দী ক্রীতদাস বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা তা নিশ্চয়ই নয়। তবু, বড়ো নৌকো বা জাহাজের দাঁড় টানবার জন্যে অমানুষিক রকমের মানুষেরই শ্রমশক্তির প্রয়োজন থেকে গেলো।

এ-অবস্থার একেবারে যেন আকাশ-পাতাল তফাত শুরু হলো আধুনিক যুগে। ঠিক কোন সময় থেকে? উনিশ শতক থেকে।

কী তফাত হলো? প্রধানত এই যে, জাহাজকে সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে যে-শক্তিটা লাগবে তা

আর মানুষের শ্রম নয়, এমন কি পাল খাটিয়ে হাওয়ার মুখ চেয়েও বসে থাকতে হবে না। তার বদলে মানুষ শুরু করে দিলো বাষ্পের শক্তিকে জাহাজ টানবার কাজে প্রয়োগ করতে। তা ছাড়া, আরো একটা বড়ো রকমের তফাত হলো: জাহাজের হাল বানাবার জন্যে মানুষ ব্যবহার করতে লাগলো প্রথমে লোহা আর তারপর ইস্পাত।

বাষ্পের শক্তিকে ব্যবহার করে কীভাবে জাহাজ চালাবার কাজটা করা যায় এ-চেষ্টা নিয়ে পরীক্ষা চলছিলো আঠারো শতক থেকেই। কোন বছর সব-প্রথম সে-চেষ্টা সফল হলো? ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছরই সবপ্রথম বাষ্প-শক্তি-চালিত এক জাহাজ অতলান্তিক মহাসাগর পার হলো। তার জন্যে সময় লেগেছিলো পুরো পঁচিশ দিন; তা ছাড়া এই জাহাজও খুব বেশি রকমের নির্ভর করেছিলো পালের ওপর—তার মানে, বাষ্প-শক্তি ছাড়াও হাওয়ার শক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়েছিলো। তবু দাঁড় ছিলো না। তার বদলে পাখার মতো দেখতে প্রোপেলার—এই প্রোপেলার বাষ্প-শক্তিতে ঘুরে জল কাটতে কাটতে জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

দাঁড় বাদ দিয়েও সমুদ্র পাড়ি দেওয়া সম্ভব হলো—সমুদ্র-জয়ের ইতিহাসে এটা তাই প্রকাণ্ড এক বিপ্লব।

কিন্তু এইভাবে বাষ্পশক্তিকে ব্যবহার করে সমুদ্র পাড়ি দিতে শিখলেও তখনকার দিনে একটা প্রকাণ্ড সমস্যা থেকে গেলো। সমস্যাটা হলো, কয়লা নিয়ে। আজকের দিনে বাষ্পশক্তি উৎপাদন করে জাহাজ চালাবার জন্যে যে-পরিমাণ কয়লার দরকার পড়ে তখনকার দিনে পড়তো তার চেয়ে চারগুণ বেশি পরিমাণ কয়লা।

আর জাহাজটাকে শুধু চালু রাখবার জন্যেই যদি ওই রকম পাহাড়-প্রমাণ কয়লার দরকার পড়ে তাহলে সে-জাহাজে করে যাত্রী বওয়া বা মাল বওয়া যে কী রকম অসুবিধের ব্যাপার তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তাই ১৮৩৫ সালেও কোনো কোনো ঠাণ্ডা-মাথার লোক বাষ্পশক্তি-চালিত জাহাজে নিয়মিত অতলান্তিক পার হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে রীতিমতো ঠাট্টা-তামাসা করতো।

১৮৩৮ সালে কিন্তু এমন এক ব্যাপার ঘটলো যাতে তাদের সবাইকার মুখ একেবারে চুন! কী ঘটলো? 'সিরিস্' বলে এক জাহাজ শুধুমাত্র বাষ্পশক্তির ওপর নির্ভর করে মাত্র ১৭ দিনে অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে লণ্ডন শহর থেকে একেবারে নিউ ইয়র্ক শহর পর্যন্ত উপস্থিত!

বাষ্পশক্তির ওপর নির্ভর করে মহাসমুদ্রকে জয় করবার কথাও আর তাই হাসি-তামাসার ব্যাপার রইলো না!

এর পর দেখতে দেখতে একেবারে যেন হুহু করে বাষ্পচালিত জাহাজের উন্নতি হতে লাগলো। আজকের দিনে এক-লাখ দেড়-লাখ মন ওজনের জাহাজে চেপে মহাসমুদ্রের বুকে বেড়িয়ে আসা যেন একেবারে ছেলেখেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৭৬ থেকে ৮০ পাতার ছবি দেখো।

পেট্রল

বাষ্প-এঞ্জিন ব্যবহারে কতোগুলি অসুবিধা আছে। যেমন:

কয়লার তাপটা প্রথমে জলে ঢুকে বাষ্প করবে তারপর বাষ্প থেকে এঞ্জিনে যাবে। এতে তাপ নষ্ট হয়ে যায়।

বাষ্পশক্তি কাজে লাগাতে হলে একটা ভারি বয়লার লাগবে। কাজেই যানবাহনের কাজে এর ব্যবহার করতে হলে রেলগাড়ির মতো লাইন পাততে হবে।

যেখানে বাষ্প তৈরি হবে তার কাছাকাছি এঞ্জিন রাখতে হবে। এক জায়গায় বাষ্প তৈরি করে অন্য জায়গাতে কাজে লাগানো যায় না। কারণ পাইপের সাহায্যে বেশি দূরে বাষ্প নিয়ে গেলে সেটা ঠাণ্ডা হয়ে জমে জল হয়ে যাবে।

প্রথম দুটো অসুবিধা দূর হলো পেট্রল এঞ্জিন আবিষ্কার হওয়াতে। পেট্রলের এঞ্জিনকে বৈজ্ঞানিকরা বলেন 'অন্তর্দাহ এঞ্জিন'। এঞ্জিনের ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে তাপ তৈরি করা হয় বলে এই নাম দেওয়া হয়েছে। আগেই বলেছি, হায়জিন নামের বৈজ্ঞানিক সিলিণ্ডারের ভেতরে বারুদ পুড়িয়ে পিষ্টন চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বারুদ দিয়ে কাজ হলো না, পেট্রল দিয়ে সেটা সম্ভব করা গেলো।

পেট্রলকে বাতাসে রেখে দিলেই উড়ে যায়। খুব কম তাপ-মাত্রাতেই পেট্রল গ্যাসে পরিণত হয়। পেট্রলের এই গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশলে খুব সহজেই আগুন ধরে যায় এবং প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। অন্তর্দাহ এঞ্জিনে সিলিণ্ডারের ভেতর পেট্রলের গ্যাস এবং বাতাসের মিশেল ঢুকিয়ে দিয়ে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিস্ফোরণ হয়ে পিষ্টনটাকে ঠেলে বের করে দেয়। সিলিণ্ডারের ভেতর এতো বেশি তাপ তৈরি হয় যে, জল দিয়ে সিলিণ্ডারটাকে ঠাণ্ডা না রাখলে, পিষ্টন এবং সিলিণ্ডার গরমে গলে যাবে।

পেট্রলের সাহায্যে কীভাবে মোটর গাড়ি চলে তা দেখা যাক। মোটরগাড়িতে সাধারণত একটা থেকে বারোটা পর্যন্ত সিলিণ্ডার থাকে। প্রত্যেক সিলিণ্ডারে একটা পিষ্টন, দুটো ভাল্‌ব্‌, এবং বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেবার 'স্পার্ক প্লাগ' থাকে। পেট্রল ট্যাঙ্ক থেকে তেল প্রথমে কারবুরেটরে আসে। সেখানে পরিমাণমতো তেল এবং বাতাসের মিশেলকে বাষ্প আকারে সিলিণ্ডারের ভেতর চালিয়ে দেওয়া হয়। সিলিণ্ডারের ভেতর পিষ্টনটা চাপ দিয়ে মিশেলটাকে গরম করে আয়তনে ছোটো করে রাখে। ঠিক সেই সময় স্পার্ক প্লাগ থেকে স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এই মিশেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড তাপ তৈরি হয় এবং মিশেলটা পিষ্টনকে ঠেলে বের করে দেয়। ক্র্যাঙ্ক স্যাফ্‌টের সাহায্যে পিষ্টনটা আবার ফিরে আসে এবং পোড়া মিশেলটাকে ভাল্বের ভেতর দিয়ে বাইরে বের করে দেয়। পিষ্টনটা এইভাবে চারটে কাজ করে :

প্রথম] ওপর থেকে নিচে নেমে এসে পাম্পের মতো মিশেলকে কারবুরেটর থেকে সিলিণ্ডারের ভেতর টেনে আনে। আসবার রাস্তায় একটি ভাল্ব থাকে। এই সময়ে সেটা খুলে গিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়।

দ্বিতীয়] পিষ্টনটা এবার ওপরে উঠে মিশেলকে চাপ দেবে।

তৃতীয়] চাপ-দেওয়া মিশেলে আগুন ধরে পিষ্টনকে সজোরে নিচে নামিয়ে দেবে। এই ধাক্কাতেই চাকা ঘোরে।

চতুর্থ] পিষ্টনটা আবার ওপরে উঠে সিলিণ্ডারের ভেতরকার পোড়া মিশেলকে যাবার রাস্তার ভাল্ব দিয়ে বের করে দেবে।

এই চারটে কাজ প্রথম থেকে আবার শুরু হবে। এইভাবে

এঞ্জিন চলে। পিষ্টনটা একবার ধাক্কা খেয়ে চারবার ওঠানামা কীভাবে করলো? ক্র্যাঙ্ক স্যাফট এবং ফ্লাই-হুইলের সাহায্যে। রাস্তায় ছুরি-কাঁচি-সানওয়ালা দেখেছো? একতরফা চাপ দিয়ে সানচাকাটাকে যেভাবে ঘোরানো হয়, মোটরগাড়িতেও তেমনি একতরফা ধাক্কা দিয়ে পিষ্টনটার সাহায্যে ফ্লাই-হুইল ঘোরানো হয়। ফ্লাই-হুইলটা আসলে একটা ভারি চাকা। একে একদিকে ধাক্কা দিলে বাকিটা নিজের ওজনে ঘুরে যায়। এর সাহায্যে পিষ্টনটা এক ধাক্কাতে চারটে কাজ করতে পারে।

ডিজেল এঞ্জিন

পেট্রল এঞ্জিন ছাড়া আরো অন্য ধরনের অন্তর্দাহ এঞ্জিন আছে। কোলকাতার নতুন দোতালা বাসগুলি ডিজেল এঞ্জিনে চলে। পেট্রল এঞ্জিনের সঙ্গে ডিজেল এঞ্জিনের কতোগুলি মূল তফাত আছে। প্রথমত, ডিজেল এঞ্জিনে পেট্রল ব্যবহার হয় না। খনি থেকে পেট্রল যে অসংশোধিত অবস্থায় আসে সেই তেলটা এতে ব্যবহার হয়। দ্বিতীয়ত, পেট্রল এঞ্জিনে যেমন পেট্রল এবং বাতাসের মিশেলকে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ডিজেল এঞ্জিনে সেটা হয় অন্য কায়দায়। সিলিণ্ডারে প্রথমে বাতাস ভরে নেওয়া হয়। পিষ্টনের সাহায্যে এই বাতাসটাকে খুব জোরে চাপ দেওয়া হয়। এই চাপে বাতাসটা বেশ উচ্চতাপে গরম হয়ে যায়। এই চাপা বাতাসের মধ্যে পিচকারির সাহায্যে তেল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। গরম বাতাসের তাপে তেলটা পুড়তে থাকে। যতোক্ষণ তেলটা জ্বলছে পিষ্টনটা বেশি নামবে না, পোড়া

শেষ হয়ে গেলে পিষ্টনটার নিচে নামার পালা শুরু হয়। এবং এই নিচে নামার জোরেই চাকা চলে। এই তফাত ছাড়া অন্য বিষয়ে এদের মিল রয়েছে। আজকাল জাহাজ চালানোতে বাষ্পের বদলে ডিজেল এঞ্জিন ব্যবহার হয়। ভারি কাজ করার জন্যে পেট্রলের থেকে ডিজেল এঞ্জিন অনেক সুবিধেজনক। অন্তর্দাহ এঞ্জিন পেট্রল এবং ডিজেল ছাড়াও অন্য কতোগুলি গ্যাসের সাহায্যে চালানো হয়। বাষ্প, পেট্রল, ডিজেল এবং গ্যাস দিয়ে যে সব এঞ্জিন চালানো হয় এদের শক্তি উৎপাদন-কেন্দ্রের কাছাকাছি ব্যবহার করতে হয়। এদের দিয়ে এক জায়গায় শক্তি উৎপাদন করে অনেক দূরে এঞ্জিন চালানো চলে না। এটা সম্ভব বিদ্যুতের শক্তির বেলায়। যেমন ধরো কাশীপুর কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়ে কোলকাতার সমস্ত অঞ্চল ছাড়াও হাওড়া এবং আশেপাশের জায়গাতে সব কারখানাগুলিতেই সেই শক্তির সাহায্যে মোটর চালানো হয়। বিদ্যুৎ-শক্তির কথা ৯৭ পাতায় শুরু করবো। তার আগে, অন্তর্দাহ এঞ্জিনের সাহায্যে কীভাবে উড়োজাহাজ হাঁকানো যায় সেই কথাটা সেরে নিই।

আকাশজয়ের কাহিনী

আকাশের দিকে চেয়ে পাখিদের দেখতে দেখতে মানুষ এককালে কতোই না হিংসে করতো, অবাক হতো! ওই রকম ভাবে আকাশে ঘুরে আসা কি মানুষের পক্ষে কোনো দিন সম্ভবপর হবে?

সেকালের মানুষ পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা কল্পনা করেছে, কল্পনা করেছে পুষ্পক রথের কথা। আর আজ?

আকাশে ভেসে দু-চার হাজার মাইল চক্কোর দিয়ে আসা নেহাতই যেন মামুলি এক ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে!

ঠাকুর্দার যুগে রেলগাড়ি দেখে মানুষ অবাক হলো।

বাবার যুগে হাওয়াগাড়ি দেখে মানুষ অবাক হলো।

তোমার যুগে? উড়োজাহাজ। তার গতি দেখে অবাক না হয়ে উপায় আছে?

কিন্তু, উড়োজাহাজের বেলায় গতির চেয়ে আশ্চর্য কথা হলো আকাশে ভাসতে পারা! এক টুকরো পালকও আকাশে বেশিক্ষণ ভেসে থাকতে পারে না। তার কারণ, পৃথিবী সব-কিছুকেই মাটির দিকে টানছে। এই টানেরই নাম মহাকর্ষ। অথচ কয়েক হাজার মন ওজনের একটা উড়োজাহাজ আজ কতো অনায়াসে কী রকম খুশিমতো আকাশে ঘুরছে!

আধুনিক এয়ারোপ্লেনের আগেও মানুষ আকাশে ভাসবার জন্যে বেলুনে হালকা গ্যাস ভরেছে, তৈরি করেছে গ্যাসভরা "এয়ারশিপ"। কিন্তু এগুলি ছিলো বাতাসের চেয়ে হালকা, তাই

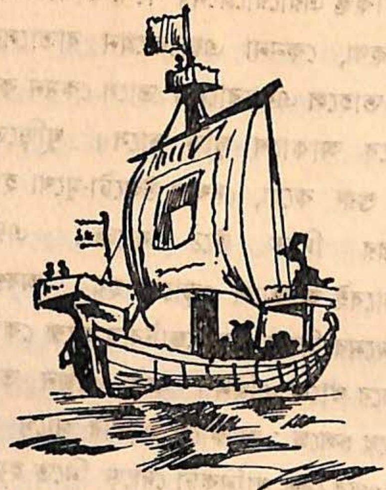
বাতাসে ভর দিয়ে এগুলির পক্ষে ভাসতে পারাটা তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু এয়ারোপ্লেনের পক্ষে ভাসতে পারাটা সত্যিই খুব বিস্ময়ের কথা, কেননা এয়ারোপ্লেন বাতাসের চেয়েও ঢের বেশি ভারি। তাহলে এয়ারোপ্লেন ভাসে কেমন করে?

যেমন ভাবে আকাশে ঘুড়ি ভাসে। ঘুড়িতে সুতো বেঁধে তুমি দৌড়তে শুরু করো, দেখবে উলটো-মুখো হাওয়ার ধাক্কায় ঘুড়িটা ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। এয়ারোপ্লেনকেও অনেকটা এইভাবেই আকাশে ওড়ানো হয়। অবশ্য তার মুখে সুতো বেঁধে সামনের দিকে টেনে ছোটবার জন্যে কেউই থাকে না, কিন্তু তার ভেতরে থাকে এঞ্জিন। এই এঞ্জিন তাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলছে: আকাশে ওড়বার আগে তাই এয়ারোপ্লেনকে জমির ওপর বেশ খানিকটা দৌড়ে নিতে হয়। তাছাড়া, অবশ্য বিরুদ্ধ মুখের হাওয়া লাগবে—ঘুড়ির বেলায় যে-রকম। এয়ারোপ্লেনের সামনে লাগানো রয়েছে প্রোপেলার—এই প্রোপেলার বনবন করে ঘুরে হাওয়া সৃষ্টি করে। তারই ঠেলায় আকাশে ভেসে ওঠে এয়ারোপ্লেন।

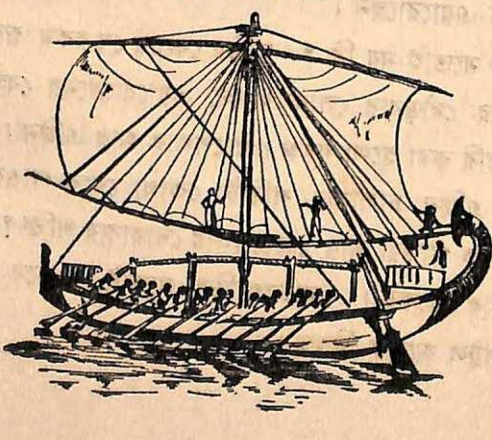
ঘুড়ির মতোই নয় কি? ঘুড়ির বেলায় যে-রকম সুতো আর সুতো ধরে দৌড়বার লোক লাগে, এয়ারোপ্লেনের বেলায় সেই রকমই তৈরি করা হলো ঘুরন্ত প্রোপেলার আর এঞ্জিন।

এই এঞ্জিন চালাবার শক্তিটা কোথা থেকে পাওয়া যায়? কোথা থেকে পাওয়া যায় প্রোপেলার ঘোরাবার শক্তি? পেট্রল পুড়িয়ে তার থেকেই। মোটরগাড়ির মতোই। তবে এয়ারোপ্লেনের পেট্রল অনেক বিশুদ্ধ।

জাহাজের কথা

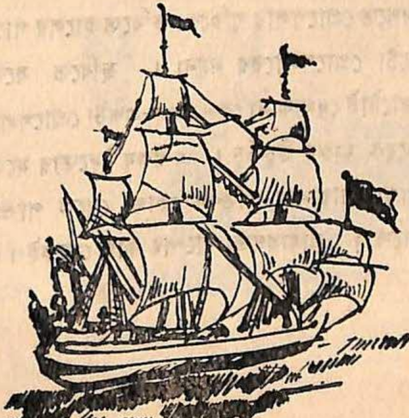


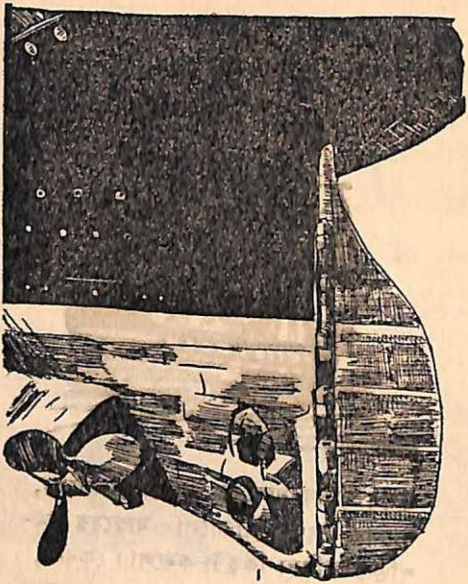
পুরোনো আমলের পাল-তোলা জাহাজ। পালের সাহায্যে হাওয়ার শক্তিকে ব্যবহার করতে শিখলেও কী অমানুষিক পরিমাণ মানুষের শক্তি যে লাগতো তা নিচের ছবিতে দেখতে পাবে।



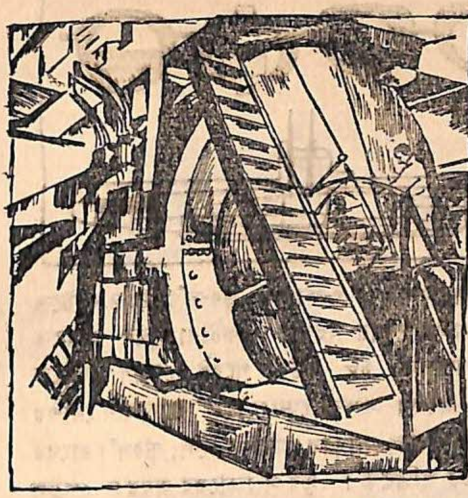


ক্রমশ মানুষ মাস্তুলের সংখ্যা বাড়ালো, পালের সংখ্যা বাড়ালো—মানুষের শ্রমশক্তির চাহিদা কিছুটা কমলো। কেননা, এখন থেকে নানামুখে বওয়া হাওয়ার স্রোতকে কাজে লাগানো সম্ভব হলো।



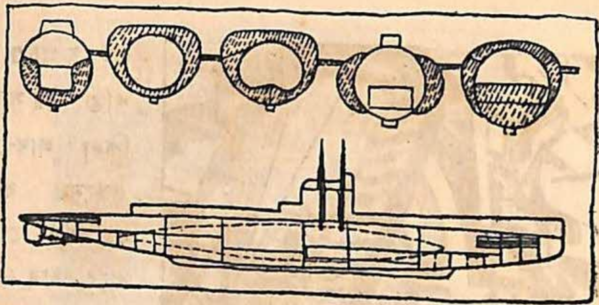


আধুনিক জাহাজ চালানো হয় পাথার মতো দেখতে প্রোপেলার ঘুরিয়ে। ছবিতে হালের পাশে দুটো প্রোপেলারের নমুনা। ছবিতে যতো ছোটোই দেখাক না কেন, এক-একটা প্রোপেলার কয়েক মানুষ উঁচুউঁচু। এ-রকম দৈত্যের মতো পাখা ঘোরাবার শক্তিটা কোথা থেকে পাওয়া যাচ্ছে? সাধারণত, বাষ্পের কাছ থেকেই।

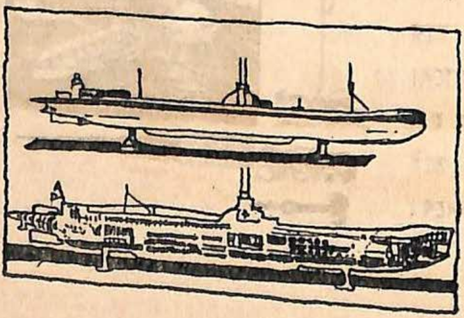


এই যে প্রচণ্ড বাষ্প-শক্তি, যার সাহায্যে কিনা লাখ-বেলাখ ওজনের জাহাজ মহাসমুদ্র পেরিয়ে যাবে, তার জোগানটা কিসের মধ্যে থেকে? বড়ো বড়ো বয়লারের মধ্যে। ছবিতে, আধুনিক জাহাজের একটা বড়ো বয়লার। কিন্তু জাহাজকে শুধুই সমুদ্রের বুকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ালেই তো হলো না। দরকারমতো দাঁড় করিয়ে রাখতেও হবে। নিচের ছবিতে দেখো, জাহাজ বেঁধে রাখবার 'বোয়া'। এগুলি নোঙরের সাহায্যে জলের তলায় মাটিতে আটকানো থাকে। অনেক সময় তার মাথায় আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়, নাবিকেরা তাই দেখে পথ চিনবে।

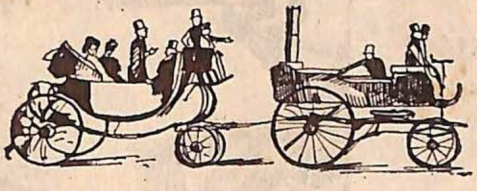




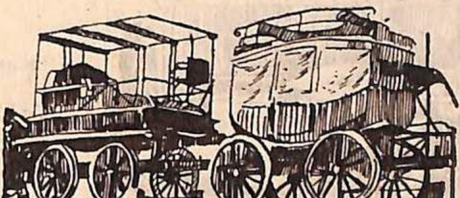
ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন : এ-জাহাজ ডুব-সাঁতারও কাটতে পারে। কিন্তু জলের তলায় বহুক্ষণ একটানা ডুবে থাকতে পারে না ; সাধারণত ৪৮ ঘণ্টা পরেই ভেসে উঠতে হয়। যতোক্ষণ জলের ওপর ভেসে চলে ততোক্ষণ বেশির ভাগ ডুবোজাহাজই পেট্রল-পোড়ার শক্তিতে চলে; ডুবসাঁতারের সময় চলে বিদ্যুতের শক্তিতে। ডুব সাঁতারের সময়ও পেট্রল পোড়াবার শক্তিতে চলে না কেন ? কারণ, পেট্রল পোড়াবার জন্যে হাওয়া লাগে ; জলের তলায় অতো হাওয়া পাওয়া যাবে কোথা থেকে ? জলের তলায় একনাগাড়ে ৪৮ ঘণ্টার বেশি থাকতে পারে না কেন ? কেননা ডুবসাঁতার দেবার সময় যে বিদ্যুৎ-শক্তি লাগবে তা পাওয়া যায় ব্যাটারি থেকে এবং এই ব্যাটারিগুলোকে চার্জ করে নেবার জন্যে খানিক পরে পরে ভেসে উঠতে হয়। ভেসে চলবার সময় চার্জ হয়ে যাবে।



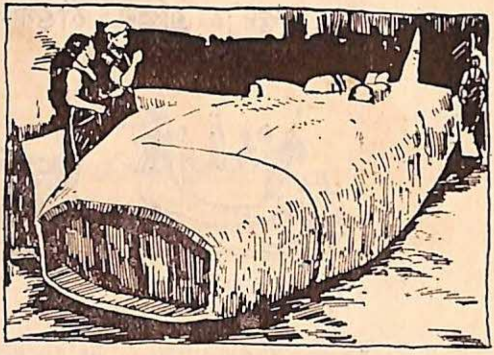
অন্তর্দাহ এঞ্জিন : হাওয়া-গাড়ি

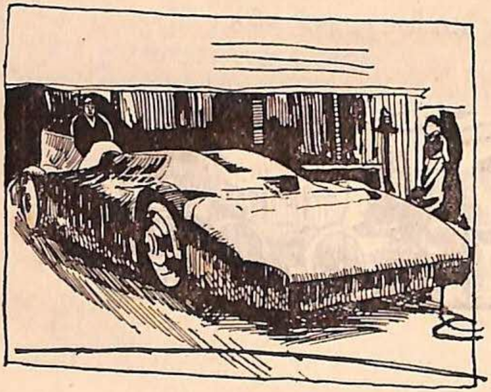


সেকালের হাওয়া-গাড়ি। চেহারা দেখে আজ এদের হাওয়া-গাড়ি বলে চিনতে পারাই কঠিন !



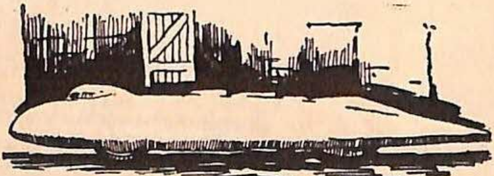
থাণ্ডারবোল্ট : ঘণ্টায় ৩৭৯·৪৯ মাইল দৌড়েছে



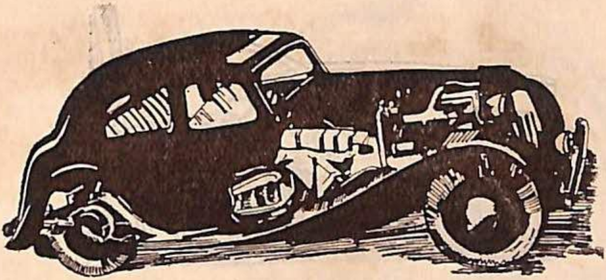


'ব্লু-বার্ড' : ঘণ্টায় ৩০১·১২৯ মাইল দৌড়েছে

'রেলটল' : ঘণ্টায় ৩৬৮·৮৫ মাইল দৌড়েছে

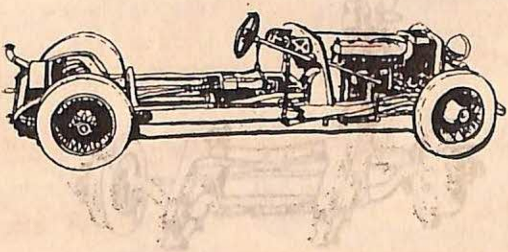


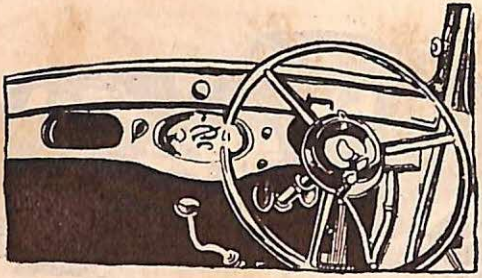
একালের তিনটি বিখ্যাত হাওয়াগাড়ি। কোনটা কী রকম জোরে দৌড়েছে তার হিসেব ছবির পাশে পাশে দেখো।



ওপরে : আধুনিক মোটরগাড়ির এঞ্জিন, গদি এবং চাকার খানিকটা অংশ খুলে দেখানো হয়েছে।

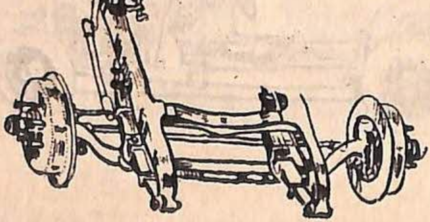
নিচে : মোটরগাড়ির বাইরের আবরণটা খুলে দেখানো হয়েছে। স্টিয়ারিং, এঞ্জিন, গিয়ার, ব্রেক, পেট্রল ট্যাঙ্ক—কোনটা কোথায় থাকে তা ছবিতে দেখতে পাবে।

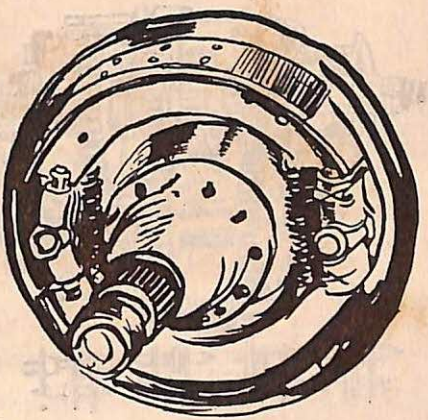


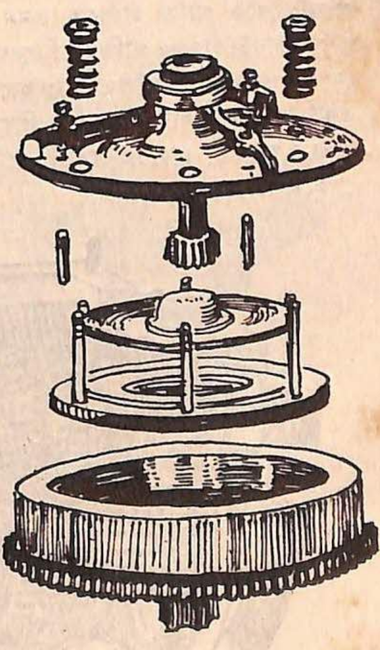


ওপরে : সামনের গোল চাকাটা হলো স্টিয়ারিং। এটা দিয়ে গাড়ি কোনদিকে যাবে তা ঠিক করা হয়।

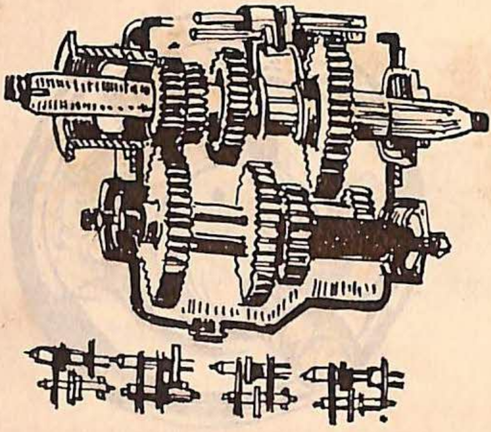
নিচে : স্টিয়ারিং কীভাবে কাজ করে দেখানো হয়েছে। স্টিয়ারিং-এর চাকার সঙ্গে একটা রড লাগানো আছে। চাকাটা ঘোরালে সেটাও ঘুরবে। এই রডটা ঘুরে আর একটা রডকে সামনে-পেছনে টানা-পোড়েন করে। দ্বিতীয় রডটাকে টাইরড বলা হয়। টাইরড এগিয়ে-পিছিয়ে চাকা দুটোকে ডাইনে বাঁয়ে কাটায়। স্টিয়ারিং রডটা টাইরডকে কী ভাবে চালাচ্ছে তলার ছবিতে দেখতে পাবে।



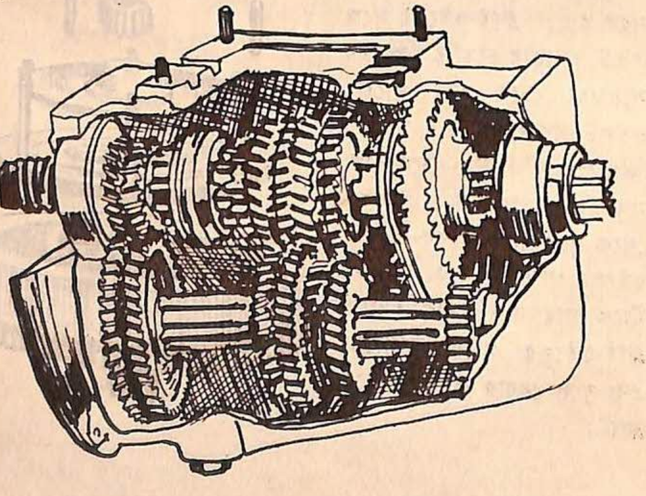


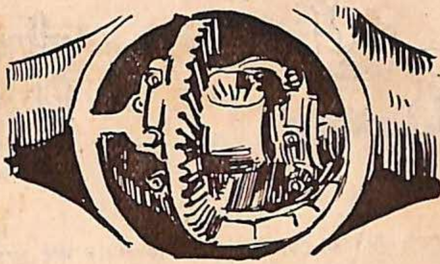


ওপরে : ক্লাচ। নিচে : ক্লাচের ভেতরটা দেখানো হচ্ছে। ক্লাচের কী কাজ? এঞ্জিনটা স্টার্ট দিলেই পিষ্টনগুলি ওপর-নিচ করে ক্র্যাঙ্ক স্যাফটটা ঘোরায়। ক্র্যাঙ্ক স্যাফটের সঙ্গে একটা ফ্লাই-হুইল লাগানো থাকে যাতে গতিটা সরল হয়। ফ্লাই-হুইলের সঙ্গে একটা লোহার চাক্‌তি স্প্রিংএর সাহায্যে চেপে ধরা থাকে। হুইলটা ঘুরলে চাক্‌তিটা ঘুরবে। কিন্তু স্প্রিংগুলি যদি টেনে রাখা যায় তাহলে চাকৃতিটা ফ্লাই-হুইল থেকে দূরে সরে আসবে—ফ্লাই-হুইলের গতিটা আর চাক্‌তি-টাকে ঘোরাবে না। চাক্‌তিটাকে ফ্লাই-হুইলের গায়ে লাগানো এবং খুলে নেবার কাজটা করে ক্লাচ।

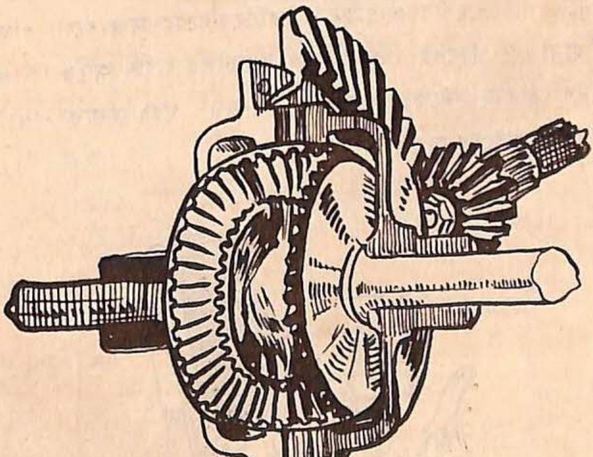


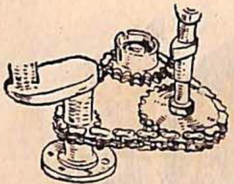
গিয়ার। ক্লাচের চাক্‌তিটার সঙ্গে একটা স্থাফ্‌ট্‌ লাগানো থাকে। এই স্থাফ্‌ট্‌টা গিয়ার বক্সের ভেতর দিয়ে গাড়ির পেছনের চাকার কাছে ডিফারেন্‌সিয়ালের ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। ফ্লাই-হুইলের ঘোরার শক্তিটা দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগানো হবে, সেটা ঠিক করে গীয়ার। থামা অবস্থা থেকে গাড়ি চালাতে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এঞ্জিনের পুরো জোরটা দিয়েও গাড়ির গতিবেগ কম থাকবে। গিয়ার বক্সের মধ্যে যে দাঁতওয়ালা চাকাগুলি দেখতে পাচ্ছো সেগুলি হলো আসল গিয়ার। একটা এঞ্জিনে সাধারণত চারটে গিয়ার থাকে। কোনোটাতে পাঁচটাও দেখতে পাবে। চারটের মধ্যে তিনটে সামনে চলবার জন্যে আর একটা পেছনে যাবার জন্যে।

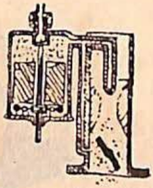




ডিফারেন্সিয়াল। গিয়ার-বক্স থেকে স্তাফ্ট্টা এসে ডিফারেন্সিয়ালে ডাইনে বাঁয়ে দুটো দাঁতওয়ালা চাকা ঘোরায়। এ দুটোর সঙ্গে গাড়ির পেছনের চাকা দুটো লাগানো আছে। এরা ঘুরলেই গাড়ির চাকা ঘুরবে।



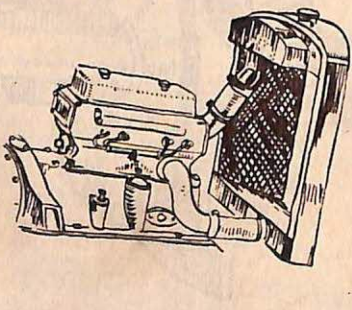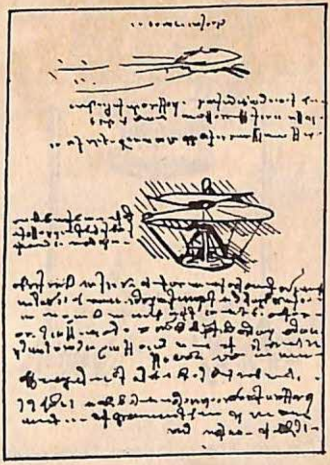




ওপরে বাঁয়ে : টাইমিং চেন। পিষ্টনের ওঠানামার সঙ্গে তাল রেখে সিলিণ্ডারের ভেতর বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ পাঠাতে হয়। ডিষ্ট্রিবিউটার থেকে নির্দিষ্ট সময়ে স্ফুলিঙ্গ পাঠাবার দায়িত্ব টাইমিং চেনের।

ওপরে ডাইনে : কারবুরেটার। পেট্রল ট্যাঙ্ক থেকে তেলটা প্রথমে কারবুরেটারের মধ্যে আসে। এ কারবুরেটারের কাজ পরিমাণমতো তেল বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে বাষ্পাকারে পরিণত করে সিলিণ্ডারের ভেতর চালিয়ে দেওয়া।

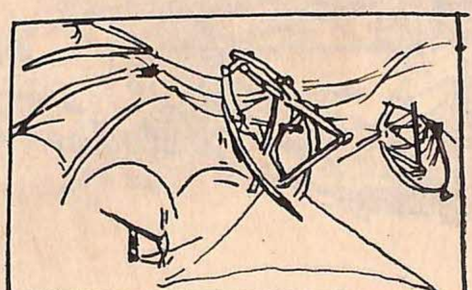
নিচে : রেডিয়েটার ও এঞ্জিন। রেডিয়েটারের কাজ হলো এঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখা। এঞ্জিনের ভেতর জল চলাচলের ব্যবস্থা আছে। জলটা এঞ্জিনের তাপটা নিজের মধ্যে নিয়ে নেয়। গরম জলকে ঠাণ্ডা করে রেডিয়েটার বাইরের হাওয়ার সাহায্যে।

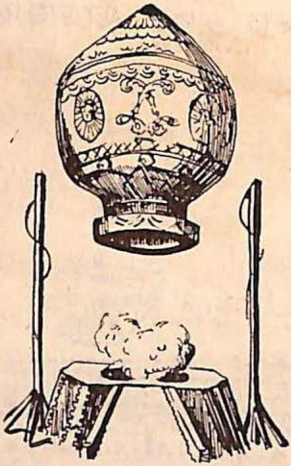




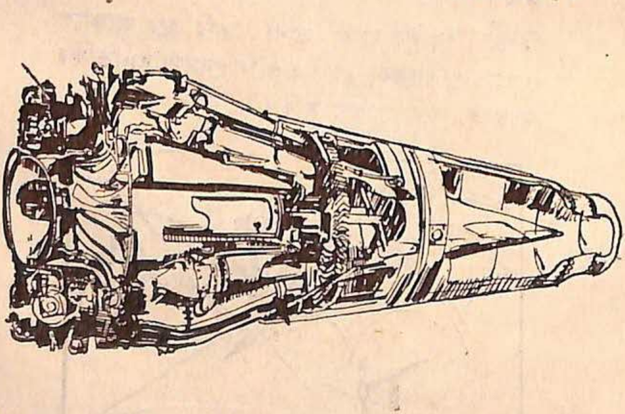
ওপরে : লিয়োনার্দো দা-ভিঞ্চির উড়োজাহাজের পরিকল্পনা। তাঁর নিজহাতে লেখা এবং আঁকা ছবি।

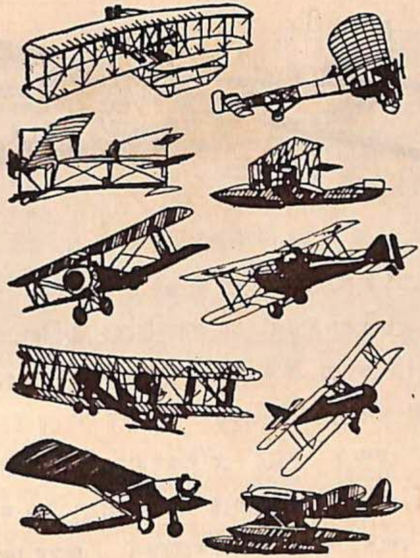
নিচে : পাখির মতো ডানা তৈরি করে আকাশে ওড়বার পরিকল্পনা। এও লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির নোটবই থেকে পাওয়া ছবি।



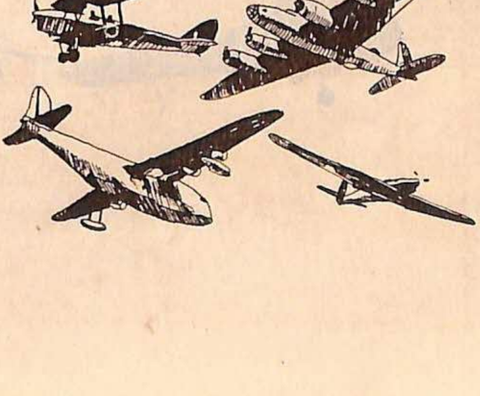


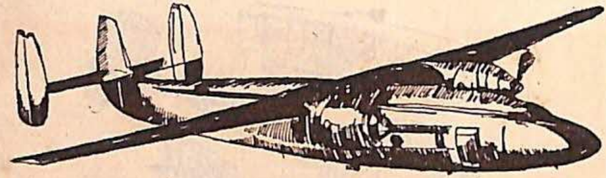
ওপরে : আকাশে ওড়বার চেষ্টা প্রথম সফল হলো এই বেলুনের সাহায্যে। ছবিতে বেলুনের মধ্যে গ্যাস ভরবার আয়োজন।
নিচে : আধুনিক উড়োজাহাজের এঞ্জিন। দেখতে যদিও খটোমটো, আসলে এটা শক্তিশালী মোটরগাড়ির এঞ্জিনই।





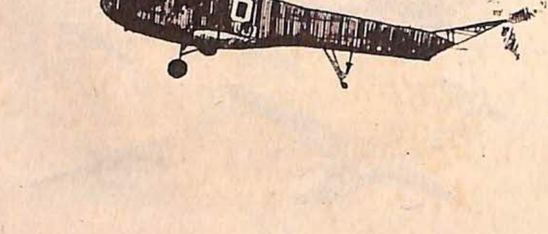
উড়োজাহাজের ক্রমবিকাশ

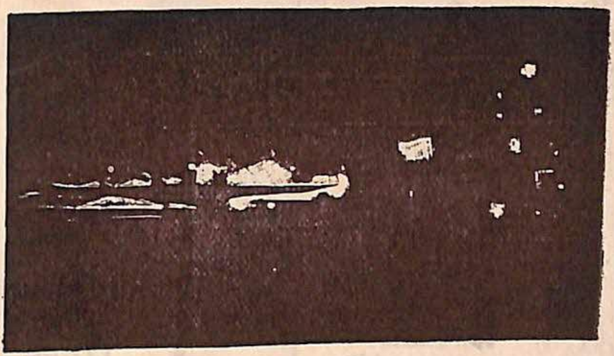




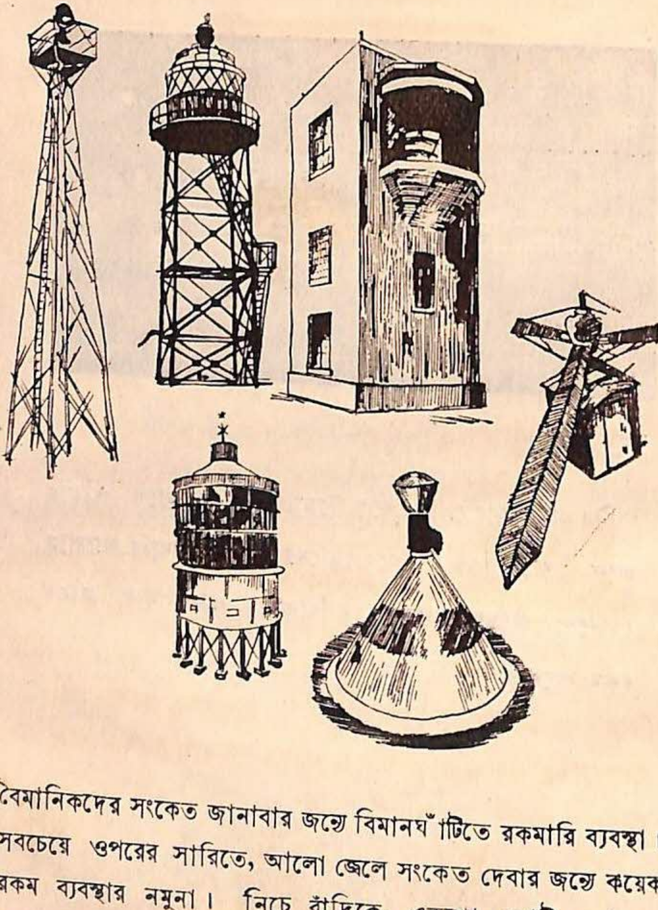
ওপরে : আধুনিক উড়োজাহাজ

নিচে : হেলিকপটার। হেলিকপটারের সুবিধা হলো এরা সোজাসুজি ওপরে উঠে যেতে পারে। উড়োজাহাজের মতো অনেকটা জায়গা নিয়ে একটু একটু করে ওপরে উঠতে হয় না। ছবিতে দেখতে পাবে হেলিকপটারের প্রপেলারটা মাথার ওপরে। এই ব্যবস্থা থাকার দরুন সোজা উঠে যাওয়া কিংবা সোজা নেমে আসা সম্ভব হয়েছে। এদের চলাচলে বড়ো এরোড্রোমের দরকার নেই। বাড়ির ছাদ হলেই চলবে।

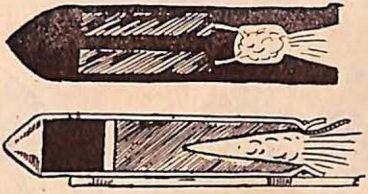




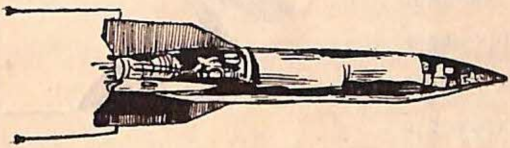
গভীর রাত্রে এরোড্রোম থেকে উড়োজাহাজ আকাশে ওঠবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এরোড্রোমের এইসব রকমারি আলোর সাহায্যে উড়োজাহাজের নাবিকেরা ওঠা-নামার নানা রকম সংকেত পায়।



বৈমানিকদের সংকেত জানাবার জন্যে বিমানঘাঁটিতে রকমারি ব্যবস্থা। সবচেয়ে ওপরের সারিতে, আলো জেলে সংকেত দেবার জন্যে কয়েক রকম ব্যবস্থার নমুনা। নিচে বাঁদিকে, একশো কোটি ক্যানডল্ পাওয়ারের আলো। তারপর টোপরের মতো দেখতে জিনিসটি হলো এয়ারোপ্লেন দৌড়বার জায়গার সীমানা জানানোর ব্যবস্থা : রাতে এর চুড়োয় আলো জ্বলে। সবচেয়ে ডান পাশে, হাওয়ার খবর জানবার যন্ত্র।

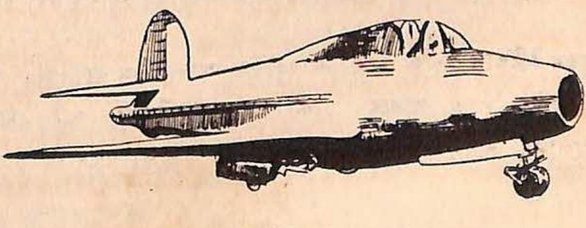


ওপরে : রকেট, —অর্থাৎ হাউই, —কীভাবে কাজ করে তাই দেখানো হচ্ছে। কালীপুজোর হাউই বাজি বারুদ পুড়িয়ে চালানো হয়। এখানে পেট্রলের সাহায্যে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা আছে।

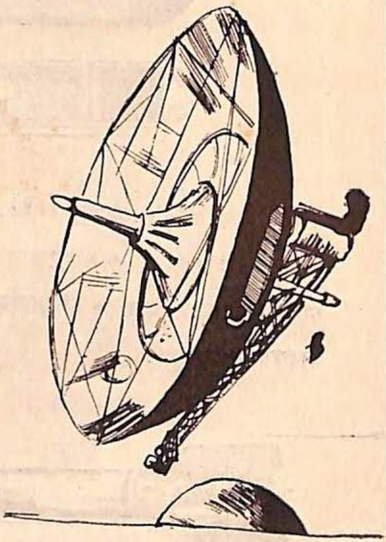


মাঝে : রকেট

নিচে : জেট-প্রোপেল্ড উড়োজাহাজ। হাউইএর মতো এরা প্রপেলারের সাহায্য ছাড়া চলে। এদের গতিবেগ অনেক বেশি হয়।



মহাশূন্যে ভেসে-থাকা বিমান ইষ্টিশান। মনে করো, রকেট চেপে কলকাতা থেকে শুক্রগ্রহে চলেছো। পথে যদি পেট্রল ফুরিয়ে যায়? এই মহাশূন্যের ইষ্টিশানে থেমে তেল ভরে নিতে পারবে। ইষ্টিশানের ঐ গোল চাকতিটা কী জন্যে? ওটা একটা আয়না, আয়নার ওপরে সূর্যের আলো পড়ে ইষ্টিশানটা গরম হয়ে ওঠে। গরম করার দরকার কী? নইলে অতো উঁচুতে ঠাণ্ডায় যে মানুষ জমে যাবে!



আরো একটা কাজ হবে। সূর্যের তাপ থেকে যে-শক্তি তৈরি হবে তাই দিয়ে রেডিও চলবে। রেডিওর সাহায্যে নিচের পৃথিবীর সঙ্গে, উড়ন্ত রকেটের সঙ্গে, অন্য ইষ্টিশানের সঙ্গে খবর দেওয়া-নেওয়া চলবে।

এই রকম ইষ্টিশান তৈরি হলে আবহাওয়া-অফিস আবহাওয়ার আরো পাকা খবর দিতে পারবে। কী করে? উঁচুতে উঠে মেঘেদের আনাগোনা, ভাবগতিক আরো ভালো করে বোঝা যাবে।

বিদ্যুৎ-শক্তির কথা

আমাদের ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বিদ্যুতের দরুন। আমাদের দেশের চেয়ে যন্ত্রশিল্পে উন্নত দেশে আজ বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা—রকমারি খুঁটিনাটি ঘরকন্নার কাজকর্মে মানুষ বিদ্যুৎ-শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে।

রাস্তায় ট্রাম চলছে। এককালে ঘোড়ায় টানতো, আজকাল বিদ্যুৎ-শক্তিতে টানে! নানান জায়গায় বাষ্পশক্তিতে চালানো ট্রেন-এঞ্জিনের পাট উঠে যাচ্ছে। ট্রেন চলছে বিদ্যুৎ-শক্তিতে। বোম্বাইএর আশপাশে ওই রকম। খবরের কাগজে পড়ছি, কলকাতার আশপাশেও ওই রকম করবার পরিকল্পনা চলেছে।

বিদ্যুৎ-শক্তিকে আজকের দিনের মানুষ যে কতো লক্ষ উপায়ে কতো লক্ষ কাজে নিযুক্ত করতে পারে তার ফর্দ তৈরি করতে পারাই এক কঠিন কাজ।

বিদ্যুৎ-শক্তি আসলে কী? কেমনভাবে এ-শক্তি উৎপাদন করা যায়?

॥ বিদ্যুৎ মানে কী? ॥

বিদ্যুৎ বলতে আসলে কী বোঝায়, এই প্রশ্ন নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন ধরে মাথা ঘামাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা আজকের দিনে,—একেবারে আধুনিক মত হিসেবে,—কী সাব্যস্ত করেছেন সেই কথাটা বলি।

'জানবার কথা'র চতুর্থ বইতে পদার্থ সম্বন্ধে যে-আলোচনা হয়েছিলো তা মনে আছে আশাকরি। যৌগিক পদার্থ আর মৌলিক পদার্থের কথা, অণু আর পরমাণুর কথা। মৌলিক পদার্থের সবচেয়ে সূক্ষ্ম যে-অংশ,—যাকে ভাঙলে ওই পদার্থ নিজের পরিচয়টাই হারিয়ে ফেলবে,—তাকেই বলা হয় তার পরমাণু বা অ্যাটম্। 'জানবার কথা'র চতুর্থ বইতেই বলেছিলাম, আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পেরেছেন যে এই অ্যাটম্ পর্যন্ত পৌঁছেই একটা পদার্থের বিশ্লেষণ শেষ হয় না—কেননা অ্যাটমটিকেও বিশ্লেষণ করা যায়, ভাঙা যায়। প্রতিটি অ্যাটম বা পরমাণু যেন এক-একটা সৌরজগতের মতো : সৌরজগতের বেলায় যে-রকম সূর্যকে কেন্দ্র করে কয়েকটি গ্রহ সব সময় ঘুরছে, তেমনি পরমাণুর বেলাতেও একটা কেন্দ্র আছে আর এই কেন্দ্রের চারপাশ ঘিরে প্রবল বেগে ঘুরছে অন্য কয়েকটি জিনিস। কেন্দ্রের জিনিস-গুলিকে বলে প্রোটন (আর নিউট্রন)। যেগুলি তার চারপাশে ঘুরছে সেগুলিকে বলে ইলেকট্রন।

কেন্দ্রে কী আছে? বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, এক রকম বিদ্যুৎ-কণা। কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে কী? বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, আর-এক রকম বিদ্যুৎ-কণা। দু রকম বিদ্যুৎ-কণা মানে? বৈজ্ঞানিকদের ভাষায়, এক রকমের নাম হলো পজিটিভ, আর এক রকমের নাম হলো নেগেটিভ। প্রোটনগুলো পজিটিভ, ইলেক্‌ট্রনগুলো নেগেটিভ। এই দু রকম বিদ্যুৎ-কণার মধ্যে সম্পর্কটা একেবারে বিপরীত হলেও পরস্পরের প্রতি তাদের দারুণ আকর্ষণ। পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণারা পরস্পরের কাছ ঘেঁষতে

নারাজ—এ ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। আবার নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণাদের মধ্যেও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কটা এই রকমই। কিন্তু একটি বিদ্যুৎকণা যদি পজিটিভ হয় আর একটি যদি হয় নেগেটিভ, তাহলে তারা পরস্পরকে খুব জোরে আকর্ষণ করবে।

এখন এক-এক রকম মৌলিকপদার্থের মূলে এক-এক রকম অ্যাটম বা পরমাণু। সোনার পরমাণু এক রকম, পারার পরমাণু আর-এক রকম। এক-এক রকম পরমাণুর কেন্দ্রে এক-এক সংখ্যক প্রোটন বা পজিটিভ বিদ্যুৎকণা। আর মজা এমনই, যে কেন্দ্রে ঠিক যে-কটা প্রোটন, কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে ঠিক সেই কটা ইলেকট্রন। সোনার পরমাণুর বেলায় ৭৯টা প্রোটন, ৭৯টা ইলেকট্রন। পারার বেলায় ৮০টা প্রোটন আর ৮০টা ইলেকট্রন। তাহলে পারার সঙ্গে সোনার আসল তফাত হলো প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংখ্যার দিক থেকেই। তা ছাড়াও অবশ্য এই ইলেকট্রন আর প্রোটন কীভাবে গোছানো রয়েছে সেদিক থেকেও তফাত আছে।

॥ একটা পরীক্ষা ॥

এইবার একটা পরীক্ষা করো। একটা খুব হালকা আর পাতলা কাগজকে ছোটো ছোটো টুকরো করে ফেলো। টুকরোগুলোকে ছড়িয়ে রাখো টেবিলের ওপর। সেগুলোর গায়ে একটা চিরুনি (বা কাঁচের কাঠি) ছোঁয়াও। কী হবে? কিছুই হবে না। কিন্তু ওই চিরুনিটাকেই যে খানিকক্ষণ রেশম ব পশমের একটুকরো কাপড়ের ওপর জোরে জোরে ঘসে

নাও আর তারপর সেটাকে ধরো কাগজের টুকরোগুলোর ওপর। দেখবে কাগজের টুকরোগুলো চিরুনির গায়ে আটকে যাচ্ছে—এমনকি, চিরুনিটা আশপাশের কাগজের টুকরোগুলোকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে।

এই পরীক্ষাটাকেই ম্যাজিক দেখাবার মতো করেও করা যায়। তাহলে ওই পাতলা কাগজের টুকরোগুলোকে ছোট্টো ছোট্টো ভূতের ছানার মতো দেখতে করে কাটতে হবে। টেবিলের ওপর তুখানা বই রেখে বই তুটোর মাঝখানে কাগজের টুকরোগুলোকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর একটা লম্বাটে কাঁচ পেতে দাও এ-বই থেকে ও-বইএর ওপর পর্যন্ত। আর একটা সিল্কের রুমাল বের করে ঘষতে শুরু করো কাঁচটার ওপর—খুব বেশি চাপ দিও না, তাহলে কাঁচটা ফেটে যাবে। কিন্তু বেশ জোরে জোরে ঘষতে থাকো। একটু পরেই দেখবে, কাঁচের নিচে বই তুটোর মাঝখানে রাখা ওই কাগজের টুকরোগুলোকে সত্যিই যেন ভূতে পেয়েছে, টেবিলের ওপর থেকে উঠে পড়ে সেগুলো কাঁচটার দিকে সরে যাচ্ছে। (১১৩ পাতার ছবি)

কাগজগুলোর কী হলো? সত্যিই ভূতে পেলো নাকি? তা নয়! আসলে কাগজগুলোর মধ্যে কোনো তফাতই হয় নি, আগে যে রকম ছিলো ঠিক সেই রকমই রয়েছে। তফাত হয়েছে কাঁচটার মধ্যে। কী তফাত হয়েছে? তার মধ্যে জন্মেছে বিত্যুৎ-শক্তি, আর এই বিত্যুৎ-শক্তির টানেই কাগজের ভূতগুলো উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে!

ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিলো চিরুনিটার মধ্যেও। রেশম

বা পশমের টুকরোয় ঘষা খেতে খেতে তার মধ্যে জন্মেছিলো বিদ্যুৎ।

॥ বিদ্যুতের জন্ম ॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঘষার চোটে বিদ্যুৎ-শক্তির জন্ম হচ্ছে। কী করে হচ্ছে ? এই প্রশ্নটির জবাব ঠিকমত বুঝতে হলে পরমাণু ও ইলেকট্রন-প্রোটনের কথাটা পরিষ্কারভাবে মনে রাখতে হবে।

পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণা বা প্রোটন। সেই কেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরছে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা বা ইলেকট্রন। এখন এই ইলেকট্রনগুলির মধ্যে কতোকগুলি পরমাণুটার সঙ্গে আটকানো রয়েছে যেন আলগোছে, ঢিলেঢালা ভাবে। ঘষার চোটে সেই ঢিলেঢালা ইলেকট্রনগুলো এ-জিনিসের পরমাণু থেকে ও-জিনিসের পরমাণুর মধ্যে চলে যায়। কাঁচের মধ্যেকার পরমাণু থেকে রেশমের রুমালে চলে গেলো। ফলে, যে পরমাণু-গুলির ভেতর থেকে এইভাবে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণারা অন্য কিছুতে চলে গেলো সেই পরমাণুগুলির মধ্যে স্বভাবতই ইলেক-ট্রনের ঘাটতি পড়বে : পেটে খাবার না থাকলে মানুষ যেরকম খাবারের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে এই পরমাণুগুলি অনেকটা যেন সেই রকমই হন্যে হয়ে উঠবে ইলেকট্রন বা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা পাবার জন্যে। এ অবস্থায় তাদের পক্ষে আশপাশের জিনিস-পত্রগুলো থেকে ইলেকট্রন কেড়ে নেবার চেষ্টাটা একটুও অসম্ভব নয়। আর হয়ও ঠিক তাই। কাঁচটার মধ্যে ইলেকট্রনের খিদে জাগে বলেই আশপাশের হালকা কাগজগুলোকে টেনে

টেনে সেগুলোর ভেতরকার ইলেকট্রনকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা দেখা দেয়।

বৈজ্ঞানিকেরা বলবেন, যে-পরমাণুগুলি থেকে ইলেকট্রন খোয়া গেলো সেগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়েছে। কেন বলবেন ? কেননা, মনে আছে তো, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে পজিটিভ আর নেগেটিভ দুরকম বিদ্যুৎ-কণার সংখ্যা সমান। আর সমান বলেই, পজিটিভ-নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণায় কাটাকুটি হয়ে যাচ্ছে— পরমাণুটার মধ্যে কোনো রকম বিদ্যুৎ-শক্তি থাকছে না। কিন্তু ঘষার চোটে যে-পরমাণুগুলির ভেতর থেকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা খোয়া গেলো সেগুলোর দশা কী রকম হলো ? নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণার তুলনায় পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণা দলে ভারি হলো—ফলে পজিটিভ-নেগেটিভ আর কাটাকুটি হয়ে যাবে না, জিনিসটার মধ্যে ফুটে উঠবে পজিটিভ বিদুৎ-কণার শক্তি।

কিন্তু এইখানে আর-একটা সমস্যা উঠছে। ঘষার চোটে কাঁচ থেকে নেগেটিভ, বিদ্যুৎ-কণা বেরিয়ে যে গেলো তা কোথায় গেলো ? সিল্কের রুমাল দিয়ে ঘষা দিলাম। তাহলে নিশ্চয়ই সিল্কের রুমালের মধ্যে গেলো। সেগুলো যদি এই সিল্কের মধ্যে থিতিয়ে থাকতে পারতো তাহলে সিল্কটাতেও নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হতো। কোন ধরনের বিদ্যুৎ-শক্তি ? নিশ্চয়ই নেগেটিভ। কেননা, স্বাভাবিক অবস্থায় তার ভেতরকার পরমাণুগুলির মধ্যে পজিটিভ-নেগেটিভ দুরকম বিদ্যুৎ-কণা সমানে সমান হবার দরুন দুয়ের মধ্যে কাটাকুটি হয়ে যাবার কথা, অর্থাৎ

কিনা বিদ্যুৎ-শক্তি না থাকবার কথা। এ অবস্থায় যদি তার মধ্যে কিছু নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা উড়ে এসে জুড়ে বসে তাহলে মোটের ওপর নেগেটিভ বিদ্যুতের কণাই দলে ভারি হবার কথা—অর্থাৎ দেখা দেবার কথা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-শক্তি। কিন্তু সত্যি বলতে, রেশমের কাপড়ে কোনো রকম বিদ্যুৎ-শক্তিই দেখা দেয় না। তার কারণ, এই নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণাগুলো তার মধ্যে এলেও সেখানে আড্ডা গাড়তে পারে না। রুমাল থেকে তোমার শরীর হয়ে মাটিতে চলে যায়।

॥ আকাশের বিদ্যুৎ ॥

ঝড়বৃষ্টির সময় আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে। সেও কি একই বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যাপার? ঠিক তাই। পুরো ঘটনাটা যে কী তা খুলে বললেই বুঝতে পারবে।

ধরো, আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে জলভরা ভারি মেঘ। এইভাবে উড়ে যেতে হলে হাওয়ার সঙ্গে ঘষা লাগে আর ঘষার চোটে চিরুনিতে বা কাঁচে যেভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি জন্মাতে দেখলাম সেইভাবেই বিদ্যুৎ-শক্তি জন্মায় জলভরা ভারি মেঘের মধ্যে। এ ছাড়া অন্যভাবেও মেঘে বিদ্যুৎ-শক্তি জন্মায়। এক ফোঁটা জল ওপর থেকে ছেড়ে দিলে বাতাসের ধাক্কায় সেটা ছোটো ছোটো জলবিন্দুতে ভেঙে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, বৃষ্টির জলবিন্দু যখন আকাশে এইভাবে ভেঙে যায় তখন প্রত্যেকটি জলবিন্দুতে বিদ্যুৎ-শক্তি জন্মায়। এই বিদ্যুৎ-শক্তি-সম্পন্ন জলবিন্দু দিয়ে তৈরি মেঘে বিদ্যুৎ-শক্তি থাকবে।

এখন এই বিদ্যুৎ-শক্তিটা এমন কোনো জিনিসের মধ্যে চলে যেতে চাইবে যার মধ্যে বিদ্যুৎ-শাক্ত নেই। আকাশেই যদি কাছা-কাছি এই রকম বিদ্যুৎ-শক্তি-হীন কোনো মেঘ পাওয়া যায় তাহলে যে মেঘটার মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি জন্মেছে সেটা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি এই অন্য মেঘের মধ্যে চলে যাবে। আমরা জমিতে বসে এই চলে-যাওয়াটাকেই দেখে বলবো, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানো ছাড়াও মাঠঘাটে বাজ পড়ে। সে আবার কী ব্যাপার? যখন ওই রকম বিদ্যুৎ-শক্তিভরা কোনো মেঘ মাটির কাছাকাছি নেমে আসে তখন তার ভেতরকার বিদ্যুৎ-শক্তিটা মাটির মধ্যে চলে যেতে চায়। আমরা সেই চলে-যাওয়ারই নাম দিই বজ্রপাত। এখন এই বিদ্যুতের শক্তিটা তো সত্যিই খুব কম নয়: মেঘ থেকে মাটিতে চলে যাবার সময় মাঝখানে যদি কোনো গাছ বা আর কিছু পড়ে তাহলে সেটাকে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। আগেকার কালের মানুষ এই শক্তিটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতো। কেবল বুঝতে পারতো না, আসল ব্যাপারটা কী। তাই কল্পনা করতো, আকাশে বসে আছে ভয়ঙ্কর শক্তিশালী এক দেবতা, তারই হাতে রয়েছে এই বজ্রশক্তি!

॥ ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ ॥

তাহলে, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটা উপায় দেখা গেলো ঘষা লাগানো। কিন্তু ঘষা দিয়ে এইভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা গেলেও সে-বিদ্যুৎকে কোনো কাজে লাগানো বড়ো কঠিন। কেননা, তাকে ধরে রাখা বা বাগ মানানো যেন এক অসম্ভব

সমস্যা। তাই তুমি হয়তো রাগ করে এই বিদ্যুৎ-শক্তিকে বলবে "অকেজো" বিদ্যুৎ-শক্তি; বৈজ্ঞানিকেরা তাকেই বলেন স্থিতিশীল বা ষ্ট্যাটিক ইলেক্‌ট্রিসিটি।

এ ছাড়া আর-এক রকমের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যায়। সেই বিদ্যুৎই আমাদের রকমারি কাজ করে দেয়। তাই তুমি হয়তো খুশি হয়ে তাকে বলতে চাইবে "খাটিয়ে" বিদ্যুৎ-শক্তি। বৈজ্ঞানিকেরা তাকেই বলেন, গতিশীল বিদ্যুৎ-শক্তি বা "কারেন্ট" ইলেক্‌ট্রিসিটি।

কীভাবে এই রকম বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করা যায়? নানান উপায় আছে। দু-একটার কথা বলি। এক হলো, ব্যাটারির সেল।

ব্যাটারির সেল কী? তার মধ্যে কী করে বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি হয়? একটা পাত্রে দু রকম জিনিস রইলো, সাধারণত তামা আর দস্তা বা জিঙ্ক। তা ছাড়া, পাত্রটায় সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হলো। এই অবস্থায় দস্তার পরমাণুগুলি খানিকটা করে পজিটিভ বিদ্যুৎ-শক্তি নিয়ে অ্যাসিডের মধ্যে চলে যায়। এই বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ-শক্তি-সম্পন্ন পরমাণুদের নাম আয়ন। আয়নে অনেক সময় একটা পরমাণুর বদলে দু-তিনটে বিভিন্ন পরমাণুর একটা জোট থাকে। দস্তার এই পজিটিভ আয়ন অ্যাসিডে চলে যাবার দরুন দস্তা হয়ে যাবে নেগেটিভ। তামার বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা হয় উল্টো। সেখানে অ্যাসিড থেকে পজিটিভ আয়ন এসে জমা হয় তামার ওপর। ফলে তামাটা হবে পজিটিভ। এবারে যদি একটুকরো তার দিয়ে

ওই দুটো জিনিসের মুখ জুড়ে দাও তাহলে যেটার মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়েছে সেটা থেকে এই শক্তি অপরটার মধ্যে চলে যাবে।

তোমার টর্চ জ্বালাবার জন্যে যে-ব্যাটারি ব্যবহার করো সেটা একটু অন্য কায়দায় তৈরি, তাকে বলে 'ড্রাই সেল'। তাতে তরল অ্যাসিডের বদলে দেওয়া হয় শুকনো রাসায়নিক জিনিস। তবে মূল নিয়মগুলি মোটের ওপর একই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঘষা ছাড়াও রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। ঘষা দিয়ে যে-বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি হলো তা অকেজো বা স্থিতিশীল। রাসায়নিক পদ্ধতিতে যে বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি হলো তা অবশ্য খাটিয়ে বা গতিশীল—তাকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু তবুও এইভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি বিদ্যুৎ-শক্তিকে শিল্পে প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। অসুবিধে প্রধানত দুরকম। এক, খরচ পড়ে অসম্ভব বেশি। অতো খরচ করে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা চলে না। দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতিতে হাজার খরচ করেও যে বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করা যায় তার জোর এতো কম যে শিল্পের কাজে তার প্রয়োগ সম্ভব নয়।

তাই গতিশীল বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করবার অন্য ব্যবস্থাও করতে হলো।

॥ ডায়নামোর বিদ্যুৎ-শক্তি ॥

ওরস্টেড বলে এক বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেছিলেন যে একটা তারের

ভেতর দিয়ে যদি বিদ্যুতের কারেণ্ট চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারটা চুম্বকের মতো কাজ করে। এর পর মাইকেল ফ্যারাডে একটা তারের কুণ্ডলীকে চুম্বকের কাছে ঘুরিয়ে দেখলেন যে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। এই দুটো ঘটনা থেকে আধুনিক ডায়নামোর সৃষ্টি। ডায়নামোতে একটা শক্তিশালী চুম্বকের ভেতর তারের কুণ্ডলীকে ঘোরানো হয়। প্রথম যুগে ডায়নামোতে স্বাভাবিক চুম্বক ব্যবহার করা হতো, কিন্তু আজকাল বিদ্যুতের শক্তি ব্যবহার করেই চুম্বক তৈরি করা হয়। একটা ইস্পাতের রডকে ঘোড়ার খুরের মতো করে বেঁকিয়ে নিয়ে তার ওপর ভালো করে তার পেঁচিয়ে তারের দুটো মুখ দিয়ে বিদ্যুতের কারেণ্ট চালিয়ে দিলে ইস্পাতটা খুব শক্তিশালী চুম্বক হয়ে যাবে। আজকাল ডায়নামোতে যে বিদ্যুৎ তৈরি হয় তার খানিকটা অংশ খরচ করে এই চুম্বক তৈরি করা হয়। অনেকটা মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো। এই তারের কুণ্ডলীটাকে কিন্তু একটা বিশেষ নিয়মে তৈরি করতে হবে। কারণ কুণ্ডলীটা প্রথম অর্ধেক ঘুরলে বিদ্যুৎটা যেদিকে যাবে বাকি অর্ধেকটা ঘোরার সময় ঠিক তার উলটো দিকে যাবে। প্রথম অর্ধেক ঘোরার সময় ডাইনে থেকে বাঁয়ে যাবে। একবার একদিকে এবং পরমুহূর্তেই বিপরীত দিকে—এইভাবে যে বিদ্যুতের কারেণ্টটা চলে তাকে 'অলটারনেটিং' কারেণ্ট বলা হয়। আবার কুণ্ডলীটাকে যদি এমনভাবে লাগানো যায় যাতে একদিককার বিদ্যুৎটা একটা তার দিয়ে যাবে, আর অন্যদিকের বিদ্যুৎটা যাবে অন্য আর একটা তারের মারফত তাহলে দুটো তারেই সোজাসুজি বিদ্যুতের কারেণ্ট থাকবে। এই ধরনের

কারেন্টকে বলা হয় 'ডাইরেক্ট' কারেন্ট। দূরের পাল্লায় বিদ্যুৎ পাঠাতে হলে অলটারনেটিং কারেন্ট ব্যবহার করা হয়। কোলকাতায় জল সরবরাহ কোথা থেকে করা হয় জানো? টালার ট্যাঙ্ক থেকে। সেখানে গেলে দেখতে পাবে, বিরাট জলের ট্যাঙ্কটা মাটি থেকে অনেক উচুতে বসানো রয়েছে। ট্যাঙ্কটা উঁচুতে বসানো হলো কেন? তার কারণ, ট্যাঙ্ক উঁচু হলে সেখান থেকে জল খুব তোড়ে পাইপের মধ্যে দিয়ে আসবে। অনেক দূরের জায়গাতেও এই জল পাঠানো সম্ভব হবে। ট্যাঙ্কটা নিচু হলে এটা সম্ভব হতো না। জলের এই উচ্চতা থেকে বলা যায় যে কতো দূরে এই জল পাঠানো যাবে এবং কতো জোরে সে জল আসবে। বিদ্যুতের বেলাতে এই 'উচ্চতা'র প্রশ্ন আছে। ডায়নামোতে কতো 'উচ্চতা'র কারেন্ট তৈরি হলো এর ওপর নির্ভর করবে বিদ্যুৎকে দূরে পাঠানোর প্রশ্ন। বিদ্যুতের এই উচ্চতাকে মাপা হয় "ভোল্ট" দিয়ে। আলেসাণ্ড্রো ভোল্টা নামে এক বৈজ্ঞানিক প্রথম 'চলমান বিদ্যুৎ' আবিষ্কার করেন। এই "ভোল্ট" কথাটা তাঁর নাম থেকেই নেওয়া হয়েছে। কোলকাতায় আমাদের বাড়িঘরে সাধারণত ২২০ ভোলটের বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। একটুকরো বিদ্যুতের তারের ওপরের খোসাটা ছাড়িয়ে ফেললে দেখবে, ভেতরে তারটা তামার। লোহার তার না দিয়ে তামার তার দেওয়া হলো কেন? লোহার দাম তো তামার চেয়ে সস্তা! এর কারণ তামা লোহার চেয়ে বিদ্যুতের ভালো পরিবাহক। যেসব জিনিসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের কারেন্ট যাতায়াত করতে পারে তাদের পরিবাহক বলা হয়—যেমন লোহা, তামা, রুপো

ইত্যাদি। কাঠ, কাঁচ, গালা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে না। কাজেই এরা বিদ্যুতের পরিবাহক নয়। ভালো আর খারাপ পরিবাহক কী? যে কোনো জিনিসের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলে জিনিসটা খানিকটা বাধা দেবার চেষ্টা করে। কোনো জিনিস কম বাধা দেয়, কোনোটা বেশি বাধা দেয়। যে পদার্থটা কম বাধা দেয় তাকেই বলা হবে ভালো পরিবাহক। পদার্থের এই বাধা দেওয়ার ক্ষমতাকে বলা হয় রেজিসটেন্স। দূরের পাল্লায় বিদ্যুৎ পাঠাতে হলে কেন বেশি ভোল্‌ট লাগবে তার কারণ বের করলেন ওমস্‌। তিনি দেখালেন যে কোনো তারের ভেতর দিয়ে কতোটা বিদ্যুৎ যাচ্ছে সেটা মাপতে গেলে জানতে হবে ভোলট এবং রেজিসটেন্স। ওমসের নিয়ম হলো

$$\text{কারেণ্টের পরিমাণ} = \frac{\text{ভোলট}}{\text{তারের রেজিসটেনস}}$$

রেজিসটেন্সের মাপ নেওয়া হয় "ওমস্‌" মাপে। এবং কারেণ্টের পরিমাণ মাপা হয় "এমপিয়ার" হিসেবে। এক ভোলটের বিদ্যুৎ ১ ওমস্‌ রেজিসটেন্সের তারের ভেতর দিয়ে গেলে ১ কুলোম্ব পরিমাণ কারেণ্ট পাওয়া যাবে।

॥ হাইড্রোইলেট্রিসিটি ॥

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কায়দা হলো, ডায়নামোর মধ্যে তারের কুণ্ডলীটাকে অর্থাৎ আর্মেচারটাকে ঘোরানো। একে খুব জোরে ঘুরিয়ে যেতে পারলেই বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে যাবে। সাধারণত একে ঘোরানো হয় বাষ্পশক্তির সাহায্যে। কিন্তু অন্যভাবেও ঘোরানো যায়। জলের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জলচাকা ঘুরিয়ে যেভাবে

গম পেশা হতো তেমনি একটা ভালো চাকা যদি বসানো যায় জোর স্রোতের মুখে তাহলে এই স্রোতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আর্মেচারকে ঘোরানোও যেতে পারে। এইভাবে উৎপন্ন হলে বিদ্যুৎকে বলে হাইড্রোইলেক্‌ট্রিসিটি। অবশ্য বিদ্যুৎ-শক্তি হিসেবে বাষ্পশক্তিতে আর্মেচার ঘুরিয়ে যে-বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হলো তার সঙ্গে এর কোনো তফাত নেই।

আমাদের দেশে দামোদরের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনার এলাকায়।

আজকের দিনে বিদ্যুৎ-শক্তিকে মানুষ লক্ষ রকম কাজে লাগাতে পেরেছে। এতো রকমের কাজ যে তার পুরো ফর্দ তৈরি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। আমরা এখানে তার মধ্যে মাত্র কয়েক রকম কাজের নমুনা দেবো।

টেলিগ্রাফ

টেলি মানে দূর আর গ্রাফ মানে লেখা। কথাগুলো নেওয়া হয়েছে গ্রীক ভাষা থেকে। মানে দাঁড়ায়, দূরের লেখা। দূরে খবর পাঠাবার কায়দা নানান রকমের হতে পারে। সেকালের মানুষ আগুন জ্বালিয়ে, দামামা বাজিয়ে, ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে— নানান ভাবে দূরে খবর পাঠাবার চেষ্টা করতো। কিন্তু এই উপায়গুলির সাহায্যে কতোদূরেই বা আর খবর পাঠানো যায়? অথচ বিদ্যুৎ-শক্তিকে খবর বইবার কাজে নিযুক্ত করতে পেরে আজকের মানুষ কী রকম যেন খেলার ছলে কয়েক হাজার মাইল দূর পর্যন্ত খবর পাঠিয়ে দিতে পারছে।

বিদ্যুৎ-শক্তিকে কীভাবে খবর বইবার কাজে লাগানো যায়? বিদ্যুতের সাহায্যে কীভাবে চুম্বক তৈরি করা যায় তার আলোচনা তো আগেই করা হয়েছে। এইবার ভেবে দেখো, একটা তারের একপ্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দিলাম একটা তার-জড়ানো লোহার টুকরো ; অন্য প্রান্ত থেকে যদি বিদ্যুৎকে বয়ে যেতে দিই তাহলে সেই লোহার টুকরোটায় চুম্বকশক্তি দেখা দেবে। ধরো, লোহার টুকরোটার সামনে রয়েছে আর একটা লোহার পাত। তাহলে যেই লোহার টুকরোয় চুম্বকশক্তি আসবে অমনি সামনের লোহার পাতটা টান খেয়ে টুকরোটার গায়ে লাগবে, টক করে একটা শব্দ হবে। তারপর, যেদিক থেকে আমি বিদ্যুৎ-শক্তিকে ওইভাবে ছেড়ে দিয়েছিলাম সেইদিক থেকে যদি বিদ্যুৎ-শক্তির যাওয়া বন্ধ করে দিই? তাহলে ওপারের লোহার টুকরোর মধ্যে থেকেও চুম্বক-শক্তি চলে যাবে, লোহার পাতটা খুলে যাবে, সরে যাবে। তাই, তারটার একপ্রান্তে আমি একরকম বোতাম বানিয়ে নিলাম, সেটাকে টিপলেই তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ ছাড়া পাবে ; আবার বোতামটাকে ছেড়ে দিলেই বন্ধ হবে বিদ্যুৎ যাওয়া। তারের অপর প্রান্তে রয়েছে চুম্বক। আর চুম্বকের সামনে রয়েছে একটা লোহার পাতলা পাত। পাতটা এমনভাবে লাগানো আছে যাতে চুম্বক-শক্তি না থাকলে পাতটা স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠবে। আবার চুম্বকশক্তি ফিরে এলেই পাতটাকে টেনে নেবে। ফলে, তারের একপ্রান্তে কায়দামাফিক বোতাম টিপতে পারলেই অপর প্রান্তে টরে-টক্কা শব্দ হতে থাকবে। কীভাবে বোতাম টিপলে কী রকম শব্দ হবে আর

কোন শব্দর মানে কা—এ-বিষয়ে আগে থাকতে ঠিকঠাক করে রাখলেই হলো। এ-বিষয়ে একটা নিয়ম ঠিক করা হয়েছে, তার নাম মর্‌স্ কোড্ : কোন অক্ষরে কটা টরে আর কটা টক্কা সে-কথা এই কোড্-এ ঠিক করা আছে।

টেলিফোন

টেলিগ্রাফের সাহায্যে বহুদূর পর্যন্ত খবর পাঠানো গেলো। কিন্তু খবরটা গেলো সাংকেতিক শব্দ হিসেবে। বলতে চাই একটা কথা, কথাটা রূপান্তরিত হলো টরে-টক্কা শব্দতে। আবার মর্‌স্-এর কোড্ অনুসারে এই সাংকেতিক শব্দকে আমাদের ভাষায় তর্জমা করে নিতে হবে। কিন্তু এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না যার দরুন বিদ্যুৎ-শক্তি একেবারে মুখের ভাষাকে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায়,—এ-দেশ থেকে ও-দেশে,—পৌঁছে দিতে পারবে? করা যায়। সেই ব্যবস্থাই হলো টেলিফোন।

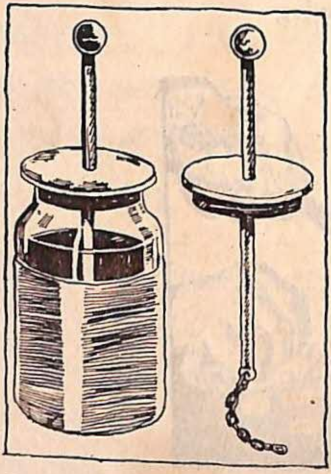
কীভাবে টেলিফোনের সাহায্যে মুখের শব্দকে অনেক দূর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব? টেলিফোনে একটা কথা বলবার চোঙা আছে, একটা কানে শোনবার চোঙা আছে। কথা বলবার চোঙার মধ্যে একটা পাতলা পর্দা রয়েছে। মুখের সামনে একটা পাতলা কাগজ ধরে কথা বলো, দেখবে কথার ধাক্কায় কাগজটা কাঁপছে। তার কারণ, শব্দ একরকম বাতাসের ঢেউ সৃষ্টি করে, এই ঢেউই কাগজকে কাঁপিয়ে দেয়। এক-এক রকম শব্দ এক-এক রকম ঢেউ সৃষ্টি করে। তার ফলে সামনের পাতলা কাগজকে এক-এক ভাবে কাঁপায়। টেলিফোনের কথা বলবার

বিদ্যুৎ-শক্তি



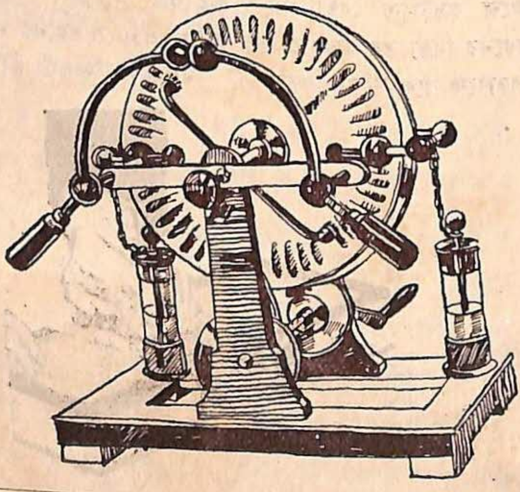
একটা কাঁচের রডকে সিল্কের কাপড় দিয়ে কিছুক্ষণ ঘসলে সেটা ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করবে। এর কারণ হলো ঘসবার জন্যে রডটাতে বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সচরাচর যে ধরনের বিদ্যুতের ব্যবহার করে থাকি এটা সে ধরনের নয়। এই ধরনের বিদ্যুৎকে বলে "স্থির-বিদ্যুৎ"। নিচের ম্যাজিকটা কী রকম ?

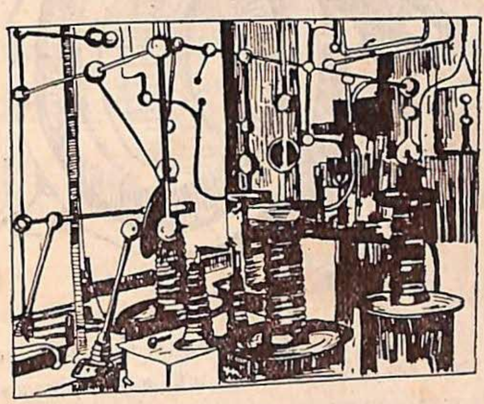




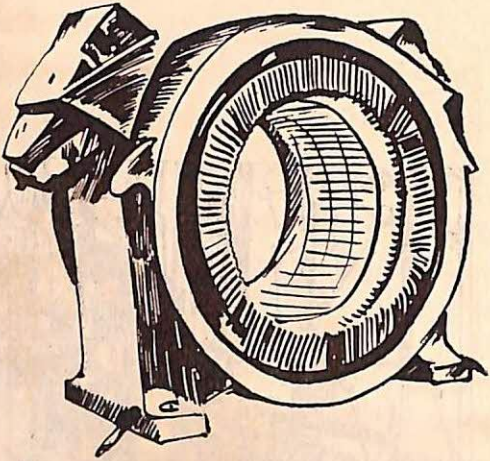
ওপরে : 'স্থির বিদ্যুৎ' জমিয়ে রাখবার যন্ত্র। একটা কাঁচের বোতলের ভেতর এবং বাইরেটা টিনের পাতলা পাত দিয়ে মোড়া আছে। একটা পিতলের রড বোতলের ভেতরে চলে গিয়েছে। রডটার ওপরদিকে একটা পিতলের বল, আর নিচের দিকে সরু শেকল। বোতলের ভেতরকার টিনের পাতের সঙ্গে শেকলটা লেগে থাকে। এদের 'লিডেন জার' বলে।

নিচে : স্থির বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র। দুটো কাঁচের চাকতি একটা হাতল দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে। ঘোরবার সময় চাকতিটা এক-টুকরো সিল্কের কাপড়ের সঙ্গে ঘসা খাচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। যন্ত্রটার দুপাশে দুটো 'লিডেন জার' রয়েছে। উৎপন্ন বিদ্যুৎকে এদের মধ্যে জমিয়ে রেখে দরকার মতো কাজে লাগানো হবে।

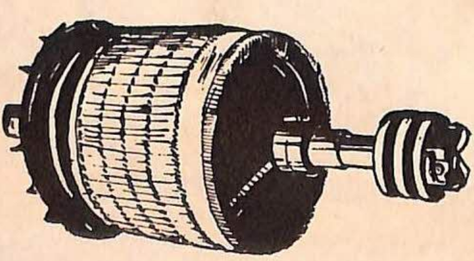


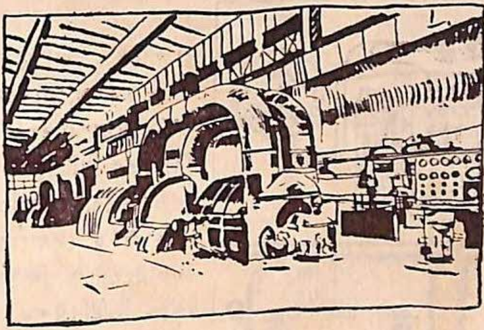


ওপরে : স্থির বিদ্যুৎ জমিয়ে রাখবার বড়ো যন্ত্র। এদের সাহায্যে শক্তিশালি বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ তৈরি করা যাবে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো এই স্থির বিদ্যুতের ফলেই ঘটে।



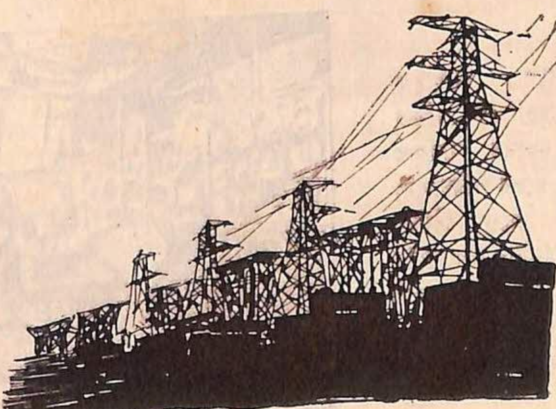
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ডায়নামো। এর সাহায্যে চলমান বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এই ধরনের বিদ্যুতের সাহায্যে আমাদের আলো জলে, পাখা চলে, ট্রাম চলে এবং চলে শিল্পে যন্ত্রপাতি। একটা চুম্বকের মধ্যে তামার সরু তারকে ঘুরিয়ে এই ধরনের বিদ্যুৎ তৈরি হয়। ওপরে: ডায়নামোর খোল: এর ভেতর চুম্বক সাজানো আছে। নিচে: একটুকরো লোহাতে সরু সরু তামার তার জড়ানো আছে। এটাকে 'আরমেচার' বলে। আরমেচারটা খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে জোরে ঘুরিয়ে দিলেই বিদ্যুৎ তৈরি হবে।

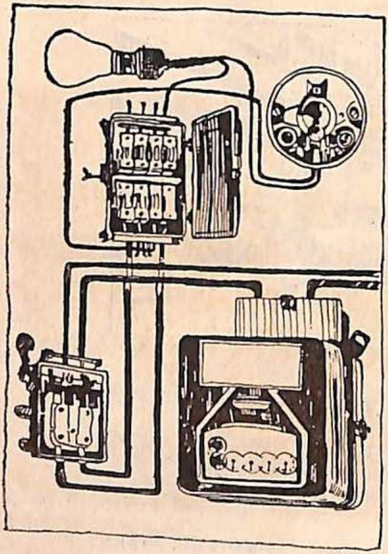




ওপরে : জলবিদ্যুতের ষ্টেশন। জলপ্রপাতের সাহায্যে 'আরমেচার' ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয়। জলের স্রোতটা অবশ্য ছবিতে দেখা যাচ্ছে না।

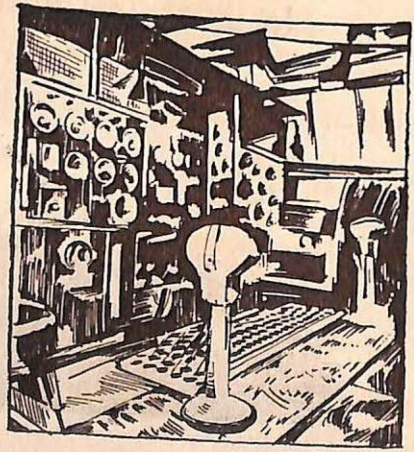
নিচে : বিদ্যুৎ পাঠাবার ব্যবস্থা। একজায়গায় বিদ্যুত তৈরি করে এদের সাহায্যে অনেক দূরে শক্তি পাঠিয়ে দেওয়া যায়।





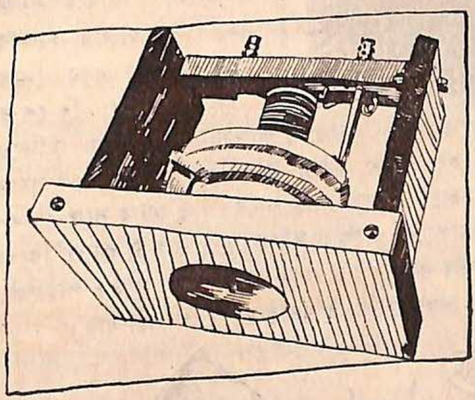
বাঁ পাশে : বাড়িতে কীভাবে বিদ্যুতের আলো জ্বালানো হয় সেটা দেখানো হচ্ছে। ছবিতে বিদ্যুতের মিটার, ফিউজ, ডিষ্ট্রি-বিউশন বোর্ড, আলোর বাল্‌ব এবং সুইচ দেখানো হয়েছে। মিটার থেকে ফিউজ, ফিউজ থেকে ডিষ্ট্রিবিউশন বোর্ড এবং সেখান থেকে সুইচ এবং আলোতে বিদ্যুতের কারেন্ট কীভাবে যায় সেটা দেখতে পাবে। মিটারে বিদ্যুৎ এসেছে উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে।

ডান পাশে : আধুনিক শিল্পে বৈদ্যুতিক শক্তির নানা ধরনের ব্যবহার হয়। এদের পরিচালনা করবার জন্যে বিভিন্ন ধরনের মিটার এবং সুইচ বোর্ড থাকে। এই ছবিটাতে এই ধরনের কারখানার 'কন্‌ট্রোল রুম'।

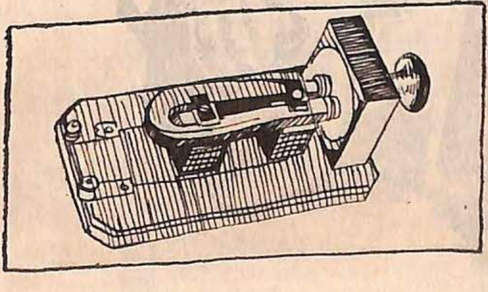


টেলিগ্রাফ

আজকের মানুষ কীভাবে দূর দেশে খবরাখবর বইবার জন্যে বিদ্যুৎ শক্তিকে নিয়োগ করেছে তার পরিচয় পেয়েছো ১১০-এর পাতায়। এই পাতায় দুটি ঐতিহাসিক যন্ত্রের ছবি দেখো : আজকের টেলি-গ্রাম ও টেলিফোন যন্ত্র যদিও এর চেয়ে অনেক উন্নত তবুও যে পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছিলো তারই ওপর নির্ভর করেছে বলে আজকের যন্ত্রপাতিগুলো এতো উন্নত হয়েছে।



ওপরে : ডক্টর আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল-এর তৈরি প্রথম টেলি-ফোন।



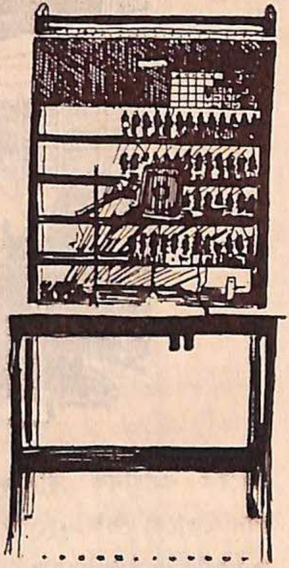
নিচে : তাঁরই তৈরি উন্নততর টেলিফো আজো আমাদে টেলিফোন-যন্ত্র তাঁর এই মূল পরিকল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।



বা-পাশে : টেলিগ্রাফে খবর সোজাসুজি কাগজে ছাপিয়ে আসছে। এই ধরনের টেলিগ্রাফ যন্ত্রে আওয়াজ শুনে খবর লিখতে হয় না। আপনা থেকে খবরটা ছেপে আসে।

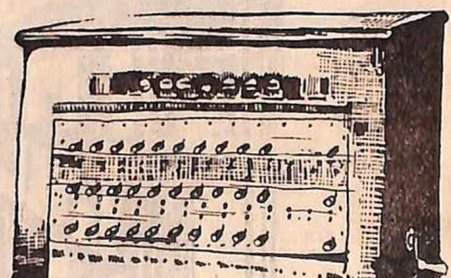
নিচে : টেলিগ্রাফে ছবি পাঠানো। প্রথমে সমস্ত ছবিটা হাজার হাজার অংশে ভাগ করে নিয়ে একটা পাতলা শিশের পাতের ওপর তুলে নিতে হবে। তারপর পাতটা একটা ড্রামে জড়িয়ে এমনভাবে ঘোরানো হয় যাতে একটা ছুঁচ এক জায়গা থেকে সমস্ত ছবিটার ওপর আলগাভাবে বুলিয়ে যেতে পারে। ছুঁচটার সঙ্গে টেলিগ্রাফ পাঠানোর তার লাগানো থাকে। ছবির ছোট্ট ভাগটা কালো কিংবা সাদা তার ওপর নির্ভর করে ছুঁচটা আলাদা আলাদা সঙ্কেত পাঠাবে। সেই সঙ্কেত থেকে ঠিক এরই উল্টো কায়দায় ছবিটা পাওয়া যায়।

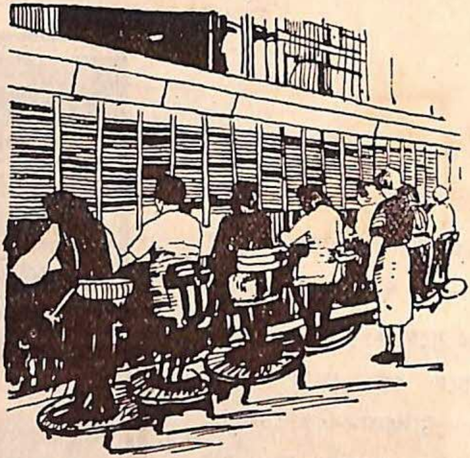




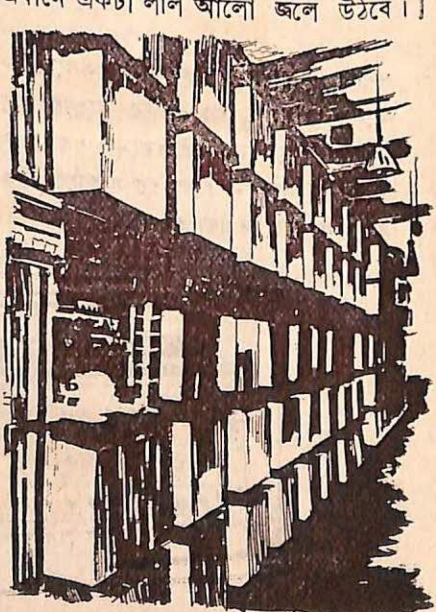
টেলিফোনের সাহায্যে তোমার গলার স্বর কী করে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায় তার আলোচনা করা হয়েছে ১১১-১১২ পাতায়, কিন্তু শহরের নানা জনের সঙ্গে কথা বলতে চায়—কে কার সঙ্গে কথা বলবে তা ঠিক করা হবে টেলিফোন-এক্‌স্‌চেঞ্জ-এ : তুমি যার সঙ্গে কথা বলতে চাও তার লাইনের সঙ্গে তোমার লাইন জুড়ে দেওয়া হবে।

ওপরে : পুরানো টেলিফোন একস্‌চেঞ্জ। নিচে : ঘরোয়া একস্‌চেঞ্জ : অনেক জায়গায় এক বাড়ির মধ্যেই অনেকগুলি টেলিফোন থাকে। সেখানে নিজেদের এই ধরনের একস্‌চেঞ্জ ব্যবহার হয়। বাইরে থেকে কারো টেলিফোন এলে এর সাহায্যে ঠিক লোকের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।



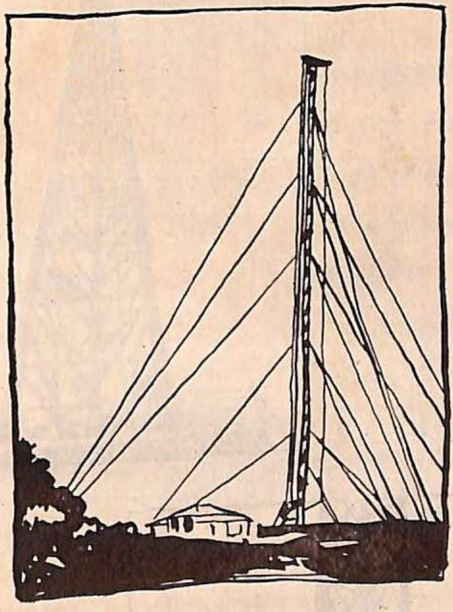


ওপরে : আধুনিক টেলিফোন একস্‌চেঞ্জ। টেলিফোনের রিসিভারটা যখন তোলো সেই মুহূর্তেই এখানে একটা লাল আলো জলে উঠবে। যে-নম্বরটা তোমার দরকার অপারেটার তার সামনের বোর্ডে সেই নম্বরের সঙ্গে তোমার লাইন যোগ করে দেবে।



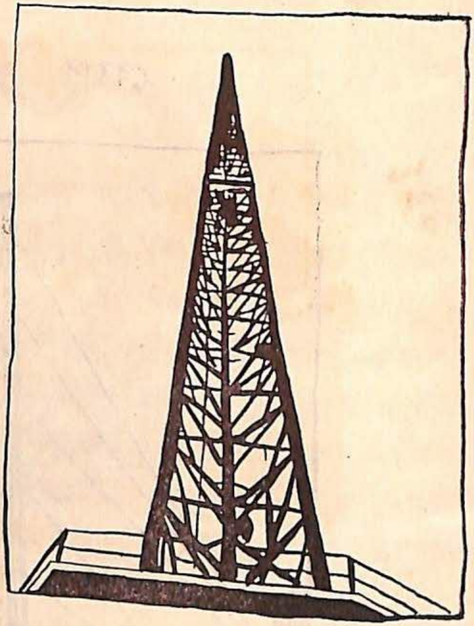
নিচে : আধুনিক অটোমেটিক একস্‌চেঞ্জ। এখানের যন্ত্রপাতিগুলোই অপারেটরের হয়ে কাজ করে দেয়।

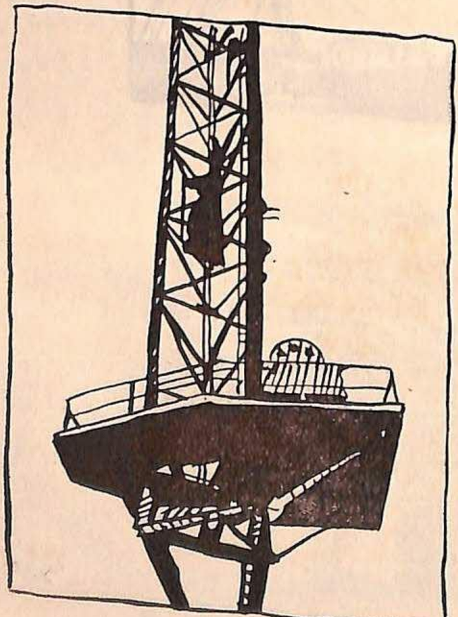
বেতার



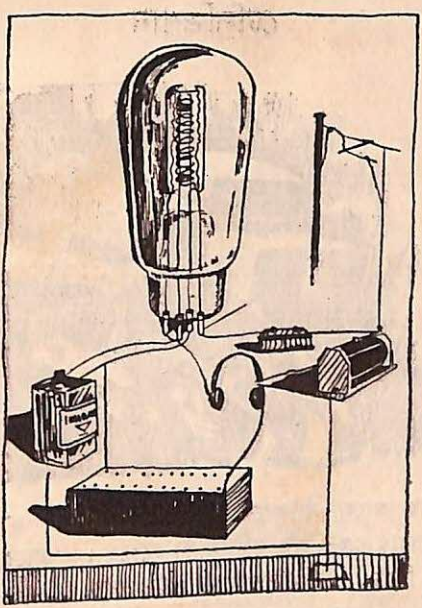
বেতারের সাহায্যে কী করে দূর দেশে খবর পাঠানো যায় তার আলোচনা পাবে ১৩০ পাতায়। সেখানেই দেখবে, বেতারে খবরাখবর পাঠাবার জন্যে কেন উঁচু মাস্তলের দরকার। এ পাতার ছবিতে দেখো, ৫০০ ফুট উঁচু বেতারের মাস্তুল।

রেডিওর বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ দূর দেশে পাঠাবার জন্যে বিরাট উঁচু উঁচু মাস্তুল লাগে। এ-পাতায় নিচের মাস্তুলটি ৮২০ ফুট উঁচু। সঙ্গে একটা ছোটো লিফট্ লাগানো।



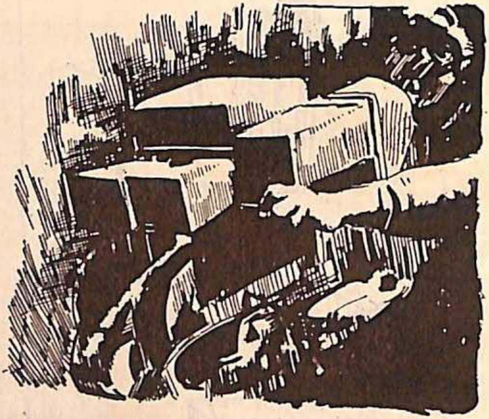


রেডিও আর চুম্বক-বিদ্যুৎ-তরঙ্গর কথা ১৩০ পাতায় পাবে।

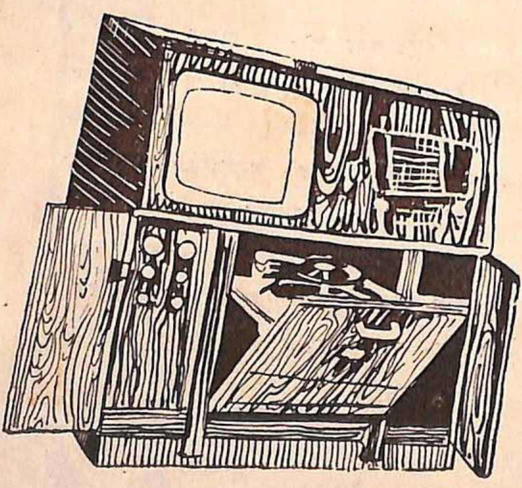


বেতারে খবর শোনবার ব্যবস্থা। ছবিতে ইলেকট্রিক বাল্‌বের মতো যে যন্ত্রটা দেখা যাচ্ছে ওটা ভাল্‌ব। ভাল্‌বের বাঁদিকে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যাটারি, ডানদিকে কানে লাগিয়ে শোনবার হেডফোন। ডান দিকে ওপরে এরিয়লের তার দেখা যাচ্ছে। ঠিক তার নিচে এরিয়ল টিউন করবার যন্ত্র। নিচে বাক্সের মতো যন্ত্রটা একটা হাইটেন-শন ব্যাটারি।

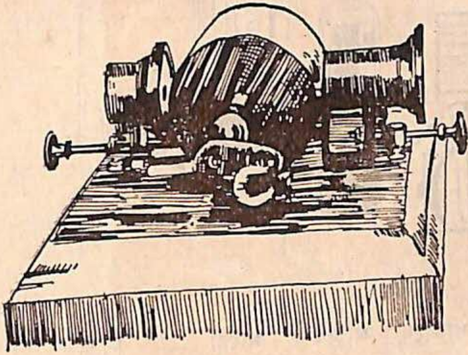
টেলিভিশান



টেলিভিশানের আলোচনা পাবে ১৩০-১৩১ পাতায়। ছবি পাঠাবার যন্ত্র আর ছবি ধরবার যন্ত্র—এই দুটি আঁকা হয়েছে। ওপরে : টেলিভিশান ক্যামেরা। নিচে : টেলিভিশানযুক্ত রেডিওগ্রাম। এই একটা যন্ত্র দিয়ে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজানো, বেতারে খবর শোনা এবং টেলিভিশান দেখা তিনটেই চলে।



গ্রামোফোন

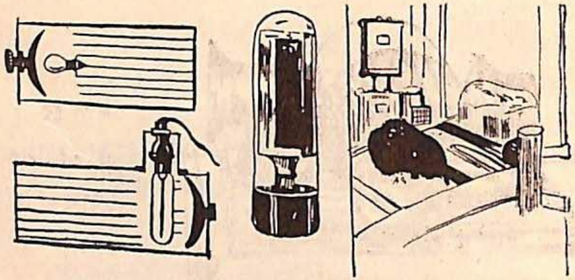


ওপরে : একটি ঐতিহাসিক যন্ত্র। টমাস এডিসনের তৈরি প্রথম ফোনোগ্রাফ (১৮৭৭)।

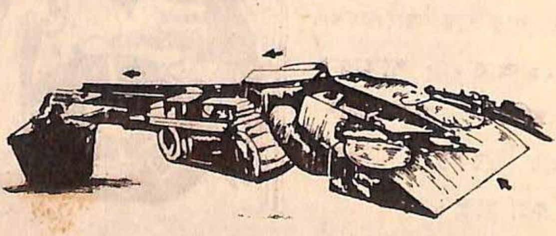


গালার চাকতিতে কী করে শব্দ ধরে রাখা যায় তার আলোচনা পাবে ১২৯ আর ১৩০ পাতায়। নিচের ছবিতে : গ্রামোফোন কারখানায় রেকর্ড বাজিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

রুটি গোণা আর ভেজাল বাছা



বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে আজকাল আরো যে কতো মজার মজার কাজ চালিয়ে নেওয়া তার দুটি নমুনা। ওপরের ছবিতে: রুটি গোনবার যন্ত্র। কারখানায় রুটি তৈরি হয়ে দুটো তীব্র আলোর মাঝখান দিয়ে পেরিয়ে গেলেই মিটারে নম্বর উঠে যাবে। আলোগুলো কী ধরনের তাও এই ছবির বাঁ দিকে এঁকে দেওয়া হয়েছে। নিচের ছবিতে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে ভেজাল বাছা হচ্ছে। একটা বেল্ট বেয়ে কতকগুলো জিনিস টবের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু টবে গিয়ে পড়বার আগেই বিদ্যুৎশক্তি ভেজাল-গুলোকে বেছে বের করে দিচ্ছে।



চোঙার সামনে মুখ দিয়ে যদি কথা বলি তাহলে তার ভেতরকার পাতলা পর্দাটাও শব্দের ঢেউতে কাঁপতে শুরু করবে—চোঙার সামনে এক-এক রকম শব্দ হলে ভেতরের পর্দাটা এক-এক ভাবে কাঁপতে থাকবে। এখন এই পর্দাটার পেছন দিকে আটকানো রয়েছে এক বোতাম আর বোতামটা গোঁজা রয়েছে কার্বনের গুঁড়োর মধ্যে। কার্বনের সঙ্গে লাগানো রয়েছে বিদ্যুতের তার। তাহলে, চোঙার সামনে জোরে শব্দ করলে পর্দাটা জোরে কাঁপবে, তার পেছনের বোতামটা জোরে চেপে বসবে কার্বনের মধ্যে—তার দরুন বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ চলবে তারের মধ্যে দিয়ে। কেন না, কার্বন যতো চাপ খায় ততোই ভালো বিদ্যুৎ-পরিবাহক হয়ে পড়ে। আর আস্তে কথা বললে? ঠিক এর উলটো। কম পরিমাণ বিদ্যুৎ তারের মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে। এইভাবে, চোঙার সামনে রকমারি শব্দতরঙ্গ রকমারিভাবে তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তিকে বইয়ে দেবে।

তারের অপর প্রান্তে কানে শোনবার চোঙ লাগানো। তার মধ্যে কী আছে? তারটা যুক্ত হয়েছে এক চুম্বকের সঙ্গে, চুম্বকটার সামনে আর একটা পর্দা। কতোখানি বিদ্যুৎ-শক্তি এলো তার ওপর নির্ভর করবে এই চুম্বকের শক্তি আর সেই অনুযায়ী এই পর্দাটা আবার কাঁপতে শুরু করবে। ফলে পর্দাটা আবার হাওয়ায় তরঙ্গ সৃষ্টি করবে—সেই শব্দতরঙ্গই। শব্দতরঙ্গ আমাদের কানে ঢুকে শব্দের খবর দেবে।

গ্রামোফোন

গ্রামোফোনের সাহায্যে গলার স্বর বা বাজনার শব্দ ধরে রাখা যায়। কী করে?

একটা গালার চাকতি বানালাম। গরম অবস্থায় গালার চাকতিটা যখন গরম রয়েছে তখন যদি তার ওপর একটা ইস্পাতের কাঁটা ধরে রাখো আর এই কাঁটাটাকে যদি টেলিফোনের কায়দায় শব্দতরঙ্গের অনুপাতে কাঁপাতে পারো, তাহলে গালার চাকতিটার ওপরেও এই কাঁটাটা রকমারি শব্দতরঙ্গের অনুপাতে আঁচড় কেটে চলবে। এর পর, ওই চাকতিটা যখন ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে যাবে তখন যদি সেটাকে গ্রামোফোনে চাপিয়ে তার ওপর একটা পিন বসিয়ে দাও আর পিনটার সঙ্গে একটা পাতলা পর্দা লাগিয়ে রাখো তাহলে ওই আঁচড় থেকে পিনটা কাঁপবে, পিন থেকে কাঁপবে পর্দা, পর্দা থেকে সৃষ্টি হবে শব্দতরঙ্গ।

বাজারে বিক্রির জন্যে যে-সব রেকর্ড তৈরি হয় সেগুলো অবশ্য সোজাসুজি এইভাবে তৈরি হয় না। প্রথমে একটা পাতলা ধাতুর চাকতির ওপর আঁচড় কেটে ও তারপর ওই ধাতুর চাকতিটাকে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে তার ওপর পাতলা ও নরম গালার চাকতি চেপে গালার রেকর্ড তৈরি করা হয়।

বেতার

শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গকে রূপান্তরিত করা সম্ভব শব্দতরঙ্গে। এই

কথা ছুটি মনে রাখলে পর রেডিওর রহস্যও আন্দাজ করা যাবে।

ছুটো কথা। এক হলো, এ জায়গায় বসে আমি শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গে রূপান্তরিত করছি। এই কাজটা করা হয় রেডিও ষ্টেশনে। এখন এই বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ প্রায় আলোর গতিতে চারদিকে ছুটতে থাকে—অর্থাৎ কিনা সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬০০০ মাইল। তারপর পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা লোক রেডিও-যন্ত্রের সাহায্যে এই বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গকে শুধু যে ধরে ফেলবে তাই নয়, এই বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গগুলিকে আবার শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করে নেবে। সে-কাজ করবার জন্যেই তো রেডিও সেটটা রয়েছে।

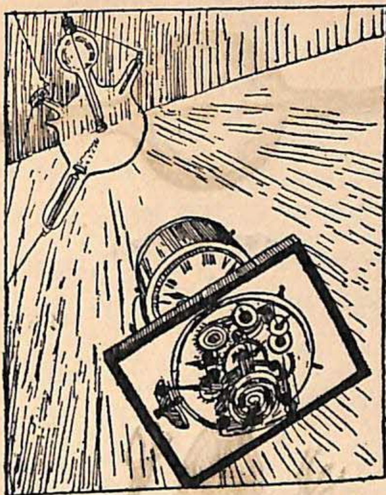
টেলিভিশন্

আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়; যার সাহায্যে তা করা সম্ভব তাকে বলে ফোটো-ইলেকট্রিক সেল। আলোর কমবেশি হলে বিদ্যুতের পরিমাণও কমবেশি হবে। একটা স্বচ্ছ প্লেটের ওপর ফোটোগ্রাফ তুলে তার ও-পিঠ থেকে আলো ফেললাম: ফোটোগ্রাফের কালো অংশ দিয়ে আলো যাবে না, হালকা অংশ দিয়ে খানিকটা আলো যাবে, সাদা অংশ দিয়ে বেশি আলো যাবে। এই যে কমবেশি পরিমাণ আলো এলো, সেটা গিয়ে পড়লো ফোটো-ইলেক্ট্রিক সেল্-এরও পর আর তাই ফোটো-ইলেক্ট্রিক সেল এই আলো থেকে রকমারি বিদ্যুৎ তৈরি করলো। তাই থেকে বিভিন্ন রকমের বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ তৈরি করা হলো। এগুলিকে বেতারের মতোই পাঠিয়ে দেওয়া হলো এদিক-ওদিক।

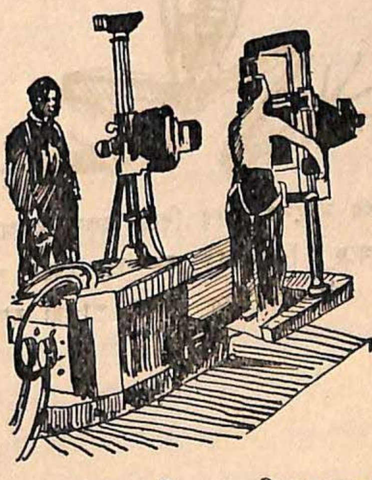
যেখানে টেলিভিশন সেট দিয়ে এগুলিকে গ্রহণ করা হবে সেখানে এগুলিকে আবার বদলে কালো-সাদা ছবি করে নেওয়া যাবে। আমরা টেলিভিশনে ছবি দেখবো।

এক্‌স্ রে

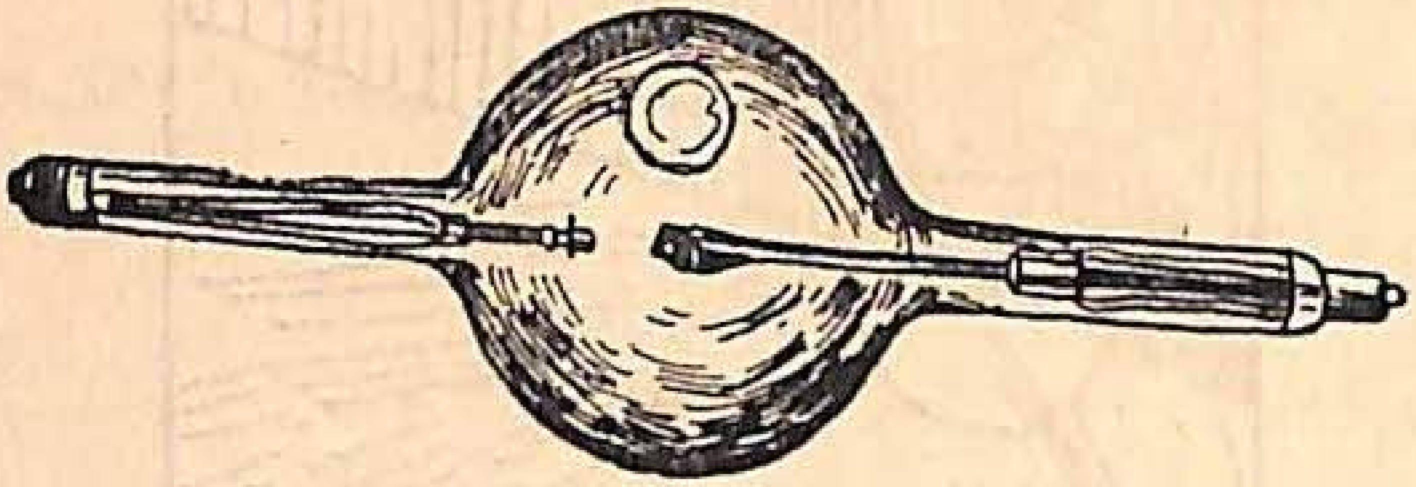
একটা কাঁচের টিউব থেকে বাতাস বের করে হুদিকটাকে বন্ধ করে দিলে। তার একদিক দিয়ে ঢুকেছে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-বাহী তার, আর একদিক দিয়ে ঢুকেছে পজিটিভ্ বিদ্যুৎবাহী তার। পজিটিভ বিদ্যুৎবাহী তারের মাথায় টাংষ্টেন্ বলে ধাতুর ছোট্ট টুকরো লাগানো। এবার হুদিক থেকে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলে সে-হুটো বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরস্পরের সঙ্গে মেলবার চেষ্টা করবে। এই পরীক্ষা থেকে রনসেন্ বলে বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করলেন, টিউবটা থেকে ওই অবস্থায় একটা অদ্ভুত আলোর রশ্মি বেরিয়ে আসছে: সেটাকে চোখে দেখা যায় না, অথচ সেটা যদি বেরিয়াম বলে ধাতুর ওপর পড়ে তাহলে বেরিয়ামটা জ্বলজ্বল করে ওঠে। রন্‌সেন্ এই আলোটাকে ঠিকমতো চিনতে পারেন নি বলেই এর নাম দেন 'এক্‌স্ রে' : X-ray। এই আলোর এক অদ্ভুত ক্ষমতা হলো, নানা রকম ঘন পদার্থ ভেদ করে তা চলে যায়।



এক্‌স্‌ রে আলোয় ঘড়ি না-খুলেই ঘড়ির ভেতরটা দেখা যাচ্ছে।



এক্‌স্‌ রে আলোয় রোগীর বুক পরীক্ষা করা হচ্ছে।



এক্‌স্‌ রে টিউব।



ব্যাঙ-এর মাংসের ভেতর দিয়ে এক্‌স্‌ রে আলো চলে গেছে ; কিন্তু হাড় ভেদ করে যেতে পারে নি। তাই কঙ্কালটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আণবিক শক্তি

আজকের দিনে মানুষ পরমাণুকে ভেঙে তার মধ্যেকার লুকোনো শক্তিকে টেনে বের করেছে! এ কি যেমন-তেমন শক্তি নাকি? এমনই প্রচণ্ড এর তেজ যে কয়েক হাজার মাইল দূর পর্যন্ত পুড়িয়ে খাক করে দিতে পারে। লক্ষ জোয়ান মিলে যে-কাজ করতে হয়তো সারা বছর গলদঘর্ম হয়ে যায়, সেই কাজই এই শক্তিকে দিয়েই মানুষ করিয়ে নিতে পারে খেলার ছলে!

মানুষের ইতিহাসে বাষ্পশক্তির আবিষ্কার একদিন যুগান্তর এনেছিলো : একটা যুগ বদলে দেখা দিয়েছিলো আর একটা যুগ। কিন্তু আজকের এই আণবিক শক্তির পাশে ওই বাষ্পশক্তির কথা যেন সার্চ-লাইটের পাশে প্রদীপের মতো—এতো তফাত!

কেমন করে মানুষ আবিষ্কার করলো এই আণবিক শক্তিকে? তার কথা ছোটো করে বলবো। কিন্তু সেই সঙ্গেই আরো একটা কথা না তুলে উপায় নেই। এ-আবিষ্কার আজকের দিনে মানুষকে কোন যুগান্তরের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়?

সে-কথাও আমরা তুলবো, ছোটো করে।

॥ রেডিও একটিভিটি ॥

১৮৯৬ সালে ফরাসী পদার্থবিদ হেনরী বেকারেল ইউরেনিয়াম ধাতু থেকে এক অদৃশ্য আলোর সন্ধান পেলেন। এই আলোর রশ্মিকে চোখে দেখা যায় না অথচ এর সাহায্যে অন্ধকারে ফোটো-গ্রাফ তোলা যায়। এই রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন মারী

স্কাডোভাস্কায়া কুরী এবং তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী। এই অদৃশ্য রশ্মির পরীক্ষা করে দেখা গেলো, এই রশ্মি তিন ধরনের ছোটো কণার সমষ্টি। এই রশ্মির আর একটা আশ্চর্য গুণ হলো, বাতাসকে বিদ্যুতের পরিবাহক করে দেওয়া। বাতাসের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না। বাতাস যদি বিদ্যুতের পরিবাহক হতো তা হলে ট্রামের তারে আর বিদ্যুতের শক্তি থাকতো না, সেটা সব বাতাসের ভেতর দিয়ে মাটিতে চলে যেতো। কুরী-দম্পতি দেখালেন ইউরেনিয়াম ধাতু ছাড়া রেডিয়াম, পোলোনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি ধাতু থেকেও এই ধরনের রশ্মি বের হয়। তাদের নামকরণ হলো—'রেডিও অ্যাকটিভ' অথবা 'তেজস্ক্রিয়' পদার্থ। আগেই বলেছি, এই রশ্মিতে তিন ধরনের কণা আছে; বৈজ্ঞানিকরা তাদের নাম দিলেন আলফা, বেটা এবং গামা।

আলফা কণা : পরীক্ষা করে দেখা গেলো আলফা কণাতে দুটো প্রোটন আছে। এবং এর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের চারগুণ। এদের পজিটিভ বৈদ্যুতিক শক্তি আছে।

বেটা কণা আসলে একটি ইলেকট্রন। কাজেই এর বৈদ্যুতিক শক্তি হলো নেগেটিভ। এই কণার বিশেষ কোনো ওজন নেই। গামা কণা : এদের দুজনের থেকে একটু অন্য ধরনের। এরা অনেকটা এক্স রের মতো।

॥ পরমাণুর গঠন ॥

তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু থেকে এই রশ্মি কেন বের হয় সে কথা আলোচনা করবার আগে, পরমাণুর গঠন সম্পর্কে ধারণাটা

পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। বৈদ্যুতিক শক্তির আলোচনার সময়ে তোমরা শুনেছো যে, পরমাণুর ভেতর একটা ছোটোখাটো "সৌরজগৎ" আছে। এই সৌরজগতের একটা কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রে পজিটিভ বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে। পরমাণুর ওজনটা হয় এই কেন্দ্র থেকে। কেন্দ্রের চারপাশের জায়গাটা প্রায় ফাঁকা এবং এখানে ইলেকট্রনগুলি প্রচণ্ড বেগে সব সময়ে ঘুরছে। এই ইলেকট্রনের গাতর বেগ ঘণ্টায় প্রায় ১৪০০ মাইল। ইলেকট্রনগুলির সংখ্যা বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে এক থেকে ৯৬ পর্যন্ত। কোনো পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রে যেই সংখ্যা পজিটিভ বিদ্যুৎ থাকে ঠিক সেই সংখ্যায় ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে। এই সংখ্যাটাকে বলা হয় "অ্যাটমিক নাম্বার"। কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক শক্তি এবং সম্মিলিত ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাণে সমান কিন্তু রূপে বিপরীত। এরই জন্যে বাইরে থেকে পরমাণুর কোনো বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন স্তরে ভাগ হয়ে থাকে। কাঁচের অণু থেকে বাইরের দিককার ইলেকট্রনকে সরিয়ে কাঁচকে বৈদ্যুতিক করা যায়। সেটা তোমরা জানো। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও পরমাণুদের বাইরের ইলেকট্রনগুলি অংশ গ্রহন করে। এই ধরনের সাধারণ প্রক্রিয়াতে পরমাণুর নিউ-ক্লিয়াসের কোনো পরিবর্তন হয় না।

॥ পরমাণুর ওজন ॥

তোমরা জানো, হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে তুলনা করে

অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের ওজন মাপা হয়। আজকাল অক্সিজেনের পরমাণুকে ১৬ ধরে অন্য পরমাণুদের ওজন বের করা হচ্ছে। ডালটন বলেছিলেন, এক পদার্থের সব পরমাণুর একই ওজন হবে। এতোদিন যেভাবে পরমাণুর ওজন মাপা হতো তাতে একসঙ্গে অনেকগুলি পরমাণুকে ওজন করে পরমাণুদের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নেওয়া হতো। কাজেই একটা মোটামুটি ওজন পাওয়া যেতো। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অ্যাসটন দেখলেন একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুর দু-তিন রকম ওজন হতে পারে। যেমন ধরো রুপো : রুপোর পরমাণুর ওজন ধরা হতো ১০৯। এই রুপোরই কতোগুলি পরমাণু পাওয়া গেলো যাদের ওজন হলো ১০৭। কিংবা হাইড্রোজেন! সবাই জানো হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজন ১। এরই ভিত্তিতে অন্য পরমাণুদের ওজন করা হয়েছে। দেখা গেলো এই হাইড্রোজেনের কতোগুলি বিশেষ পরমাণুর ওজন প্রায় ২। একই পদার্থে পরমাণুর বিভিন্ন ওজন থাকলে তাদের বলা হয় "আইসোটোপ"। দুই ওজনের হাইড্রোজেন আইসোটোপকে বলা হয় ডিউটেরন।

এবার তেজস্ক্রিয়দের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা কণা বেরিয়ে গেলে পরমাণুর কোনো পরিবর্তন হবে? হবে। কারণ প্রথমত পরমাণুর ওজন থেকে ৪ কমে যাবে। দ্বিতীয়ত তার অ্যাটমিক নাম্বার থেকে ২ কমে যাবে। কিন্তু যদি একটা বেটা কণা বেরিয়ে যায় তাহলে? পরমাণুর ওজন কমবে না—কারণ বেটা কণার কোনো ওজন নেই —কিন্তু অ্যাটমিক নাম্বার বেড়ে যাবে—কারণ এ পরমাণুতে

একটা ইলেকট্রনের সংখ্যা কমলো। এইবার আমরা এক পদার্থ থেকে অন্য পদার্থ তৈরি করার কথা ভাবতে পারি।

নাইট্রোজেনের পরমাণুর ওজন হলো ১৪ এবং অ্যাটমিক নাম্বার হলো ৭। নাইট্রোজেনের পরমাণুতে যদি একটা আলফা কণা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরমাণুটার ওজন হবে ১৮ এবং অ্যাটমিক নাম্বার হবে ৯। রাদারফোর্ড এই পরীক্ষাটা করলেন। তিনি কী পেলেন?

নাইট্রোজেন থেকে তৈরি হলো অক্সিজেনের একটা আইসোটোপ এবং হাইড্রোজেন। মনে হচ্ছে, অ্যালকেমিষ্টদের স্বপ্ন যেন বাস্তব হয়ে উঠলো। নিউট্রন : ঠিক এমনি ধরনের আর একটা পরীক্ষা করে ফ্রেডারিক জোলিও কুরী এবং তাঁর স্ত্রী ইরেন পরমাণুর ভেতর থেকে এক নতুন ধরনের কণা আবিষ্কার করলেন। বেরিলিয়াম ধাতুর একটা পাতের ওপর আলফা কণা দিয়ে আঘাত করলে একরকম কণা পাওয়া যায় যাদের কোনো বৈদ্যুতিক-শক্তি নেই। এদের ওজন করে দেখা গেলো এরা প্রায় প্রোটনের সমান ওজনের। এদের নাম দেওয়া হলো নিউট্রন। এই নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সঙ্গেই থাকে। তাহলে পরমাণুর সংগঠন কী হবে? কেন্দ্রে প্রোটন এবং নিউট্রন, বাইরে ইলেকট্রন।

কতোগুলি পদার্থের পরমাণুর ছবিটা দেখা যাক :

হিলিয়াম —	কেন্দ্রে	—	২	প্রোটন
			২	নিউট্রন
	বাইরে	—	২	ইলেকট্রন
ইউরেনিয়াম (২৩৫)	কেন্দ্রে	—	৯২	প্রোটন

১৪৩ নিউট্রন
বাইরে — ৯২ ইলেকট্রন
হাইড্রোজেন — কেন্দ্রে — ১ প্রোটন
বাইরে — ১ ইলেকট্রন

এই নিউট্রনের আবিষ্কার আণবিক শক্তির ক্ষেত্রে একটা যুগ এনে দিলো। নিউট্রনে কোনো বৈদ্যুতিক-শক্তি নেই। সেই জন্যে এদের অন্য পরমাণুর কেন্দ্রে ঢোকানো সহজ। প্রোটনকে ঢোকানো কিন্তু ততো সহজ হবে না। কেন? তোমরা পড়েছো এক ধরনের দুটো বিদ্যুতের কণা পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেবে। সেইজন্যে একটা প্রোটনকে অন্য প্রোটনের কাছে পাঠানো খুব শক্ত। বুঝতেই পারো, নিউট্রনের বেলায় এই ঝামেলা নেই। তাছাড়া আর একটা কথাও আছে। বাতাসের মধ্যে দিয়ে একটা আলফা কণা কিংবা একটা প্রোটন চলে গেলে বাতাস বৈদ্যুতিক শক্তি পাবে সেটা তোমরা আগেই শুনেছো। এর কারণ, দুটোই বৈদ্যুতিক-শক্তি-সম্পন্ন কণা। এর ফলে দুটো কণার খানিকটা করে শক্তি বাতাসে চলে যাবে। এই শক্তিক্ষয় হবার দরুন কণাগুলি খুব জোরে বেশি দূর ছুটতে পারে না। শক্তিক্ষয় হয়ে থেমে যায়। নিউট্রনের এই বালাই নেই। একবার একে জোরে ছুটিয়ে দিলে অনেক দূর পর্যন্ত বেশ জোরের সঙ্গেই সেটা ছুটবে—শক্তিক্ষয় হবে না। কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে বাইরে থেকে কণা ঢুকিয়ে পদার্থের রূপ পরিবর্তন করার কাজে এদের লাগানো সহজ হবে।

॥ পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে নতুন ধারণা ॥

নিউট্রন আবিষ্কার হবার পর পরমাণুর কেন্দ্র সম্পর্কে আরো নতুন তত্ত্ব পাওয়া গেলো। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুরা স্বাভাবিক অবস্থায় কেন কেন্দ্র থেকে কণা বিকিরণ করে সে কথা এবার বোঝা গেলো। যে সব পরমাণুতে প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যা কম তাদের ভেতর যদি প্রোটন এবং নিউট্রন একই সংখ্যায় থাকে তাহলে সেই পরমাণুগুলি স্থায়ী হবে। অর্থাৎ নিজে থেকে কেন্দ্র ভেঙে কণা বিকিরণ করবে না। কিন্তু যেসব পরমাণুতে বেশি সংখ্যক প্রোটন এবং নিউট্রন আছে সেখানে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের চেয়ে কিছু বেশি না থাকলে তারা স্থায়ী হবে না। যেসব পরমাণুতে ৯০ থেকে বেশি প্রোটন আছে এবং ১৫০-এর কাছাকাছি নিউট্রন আছে তারা সম্পূর্ণ অস্থায়ী। এইসব পরমাণু নিজে থেকে ভেঙে যাবে এবং বিভিন্ন কণা বিকিরণ করে কোনো স্থায়ী পরমাণুর রূপ নেবার চেষ্টা করবে।

॥ পরমাণুর শক্তি ॥

পরমাণুর রূপ এবং গুণ জানা গেলো। এবার আসল ব্যাপারের আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। পরমাণুর শক্তি। আলফা কণার কথা আগেই বলেছি। এই কণাতে দুটো প্রোটন এবং দুটো নিউট্রন আছে। আসলে এটা হলো একটা হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র। এই কেন্দ্রকে ওজন করা হয়েছে। এর ওজন হলো ৪·০০২৮০। প্রোটন এবং নিউট্রনের ওজন আমরা জানি। প্রোটনের ওজন ১·০০৭৫৮ এবং নিউট্রনের ওজন ১·০০৮৯৩।

হুটো প্রোটন এবং হুটো নিউট্রন যোগ করে যদি একটা আলফা কণা তৈরি হয়ে থাকে তাহলে তার ওজন হওয়া উচিত :

২×১.০০৭৫৮+২×১.০০৮৯৩=৪.০৩৩০২

কিন্তু আমরা আলফা কণার আসল ওজন পাই ৪.০০২৮০। তাহলে ০.০৩০ এই পরিমাণ পদার্থ কোথায় গেলো ? খুব ভালো করে মেপে দেখা গেলো, এই পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধান হলো পদার্থবিজ্ঞানের একটা নিয়ম থেকে। ১৯০৫ সালে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন বলেছিলেন পদার্থ এবং শক্তিতে কোনো প্রভেদ নেই। পদার্থ শক্তির এক রূপ। একটা থেকে অন্যটাতে রূপান্তর হওয়া সম্ভব। কতোটা পদার্থ থেকে কতোটা বৈহ্যুতিক-শক্তি পাওয়া যাবে তার একটা হিসেব তিনি দিয়েছিলেন। হিসেব অনুযায়ী :

১ সের পদার্থ থেকে প্রায় ২৫০০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিহ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। এর মানে কী জানো ? ১৯৪৯ সালে ভারতবর্ষের সারা বছরে প্রায় ৫০০ কোটি কিলোয়াট ঘণ্টা বিহ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বাড়িঘরে আলো-পাখা চালানো থেকে শিল্পে মেশিন পর্যন্ত যাবতীয় সব কিছু চলেছে এই বিহ্যুতে। এক সের কাঠ থেকে তাহলে এতো বিহ্যুৎ পাওয়া যাবে যার সাহায্যে আমাদের ৫ বছর চলে যাবে। কথাটা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে হাইড্রোজেন বোমার শক্তির কথা মনে করো। এই নিয়ম অনুযায়ী হুটো প্রোটন এবং হুটো নিউট্রনকে মিশিয়ে একটা আলফা কণা তৈরি করলে কতোটা শক্তি পাওয়া যাবে সেটা হিসেব করা হয়েছে। এই হিসেব অনুযায়ী প্রোটন এবং নিউট্রন মিলিয়ে

একগ্রাম আলফা কণা কিংবা হিলিয়াম পরমাণর কেন্দ্র তৈরি করলে প্রায় ২ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাবে। হিসেব করে তো পাওয়া গেলো। কিন্তু বাস্তবে কী এই হিসেব? এর প্রমাণ করলেন কক্রফট এবং ওয়ালটন। এঁরা লিথিয়াম ধাতুর কেন্দ্রে একটা প্রোটন দিয়ে আঘাত করলেন। প্রোটনটা কী করে পাওয়া গেলো? তোমরা জানো, হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন আছে। কোনো কায়দায় ইলেকট্রনটাকে সরিয়ে দিতে পারলেই প্রোটনটা পাওয়া যাবে। কাঁচের রডকে বৈদ্যুতিক করেছিলে কী করে? ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে। তেমনি হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে তেজস্ক্রিয় চালিয়ে দিলে হাইড্রোজেন পরমাণু বৈদ্যুতিক শক্তি পাবে অর্থাৎ এর ইলেকট্রনটা আলাদা হয়ে যাবে। প্রোটনটা আলগাভাবে পাওয়া যাবে। এই প্রোটনটাকে আলাদাভাবে বের করা খুব শক্ত নয়। এইভাবে প্রোটন জোগাড় করে লিথিয়ামের কেন্দ্রকে আঘাত করা হলো। আঘাত করতে হলে শক্তি দরকার। সেটা দেওয়া হলো বাইরে থেকে বিদ্যুতের সাহায্যে। দেখা গেলো লিথিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র ভেঙে গিয়ে দুটো আলফা কণা তৈরি হলো।

$$_{3}Li^{7} + _{1}H_{1} \rightarrow _{2}He^{4} + _{2}He^{4}$$

(ওপরের অঙ্কগুলি আণবিক ওজন, নিচের গুলি অ্যাটোমিক নাম্বার)। এই পরিবর্তনে ০.০১৮৫ পরিমাণ ওজন ক্ষতি হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো বৈদ্যুতিক শক্তি। শক্তিটা মেপে দেখা গেলো আইনষ্টাইনের নিয়ম মিলে যাচ্ছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও কেন আণবিক শক্তি ব্যবহার করা গেলো না? ব্যাপারটা

তো বেশ সহজ। একগ্রাম হাইড্রোজেন ও ৭ গ্রাম লিথিয়াম জুড়ে দিতে পারলেই তো প্রায় ৫ লক্ষ কিলোয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এ সত্ত্বেও তৈরি করা হয়নি কেন? প্রোটন দিয়ে সুবিধে না হলেও নিউট্রন দিয়ে তো পারা যাবে? কারণ কতোগুলি অসুবিধে এখনও রয়ে গেছে।

এই সব পরীক্ষা থেকে বেথে দেখালেন সূর্যের শক্তি অনেকটা এই কায়দায় তৈরি হচ্ছে। সেখানে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে এবং এর ফলেই ওই প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায়।

আরো অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে আসতে হলো। ১৯৩৯ সালে জোলিও কুরী দেখালেন যে, ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে যদি নিউট্রন ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ইউরেনিয়াম কেন্দ্র অস্থায়ী হয়ে যায় এবং সেটা ভেঙে গিয়ে দুটো হাল্কা পরমাণু কেন্দ্র তৈরি হবে। এবং এই সঙ্গে বিরাট পরিমাণের শক্তি বেরিয়ে আসবে। আণবিক বোমার এই হলো মূল মন্ত্র। ইউরেনিয়াম (২৩৫) পরমাণুর কেন্দ্রে ৯২টা প্রোটন এবং ১৪৩ নিউট্রন আছে। এর ভেতর একটা নিউট্রন ঢোকালে হবে ১৪৪টা নিউট্রন। এই কেন্দ্রটা ভেঙে গিয়ে দুটো কেন্দ্র হবে যাদের প্রত্যেকটার ভেতর থাকবে ৪৬টা প্রোটন এবং ৭২টা নিউট্রন। বুঝতেই পারো যে এই শেষের কেন্দ্রগুলি অস্থায়ী হবে কারণ এদের মধ্যে নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটন থেকে অনেক বেশি। কাজেই এরা আবার ভেঙে গিয়ে কোনো স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হবার চেষ্টা করবে। এই প্রোটন সংখ্যার যে কেন্দ্র আছে সেটা হলে প্যালাডিয়ামের। তার কেন্দ্রে আছে ৪৬টা প্রোটন এবং ৬৪টা নিউট্রন। তাহলে বাকি

৮ নিউট্রন বেরিয়ে আসবে। এই নিউট্রনগুলি অন্য ইউরেনিয়াম পরমাণু কেন্দ্রে আঘাত করবে। এইভাবে একবার একটা নিউ-ট্রন ঢুকিয়ে দিলে নিজে থেকে একের পর এক সব পরমাণুগুলি ভেঙে যাবে। যতোক্ষণ একটা পরমাণুও বাকি থাকবে এই প্রক্রিয়া থামবে না। আর এর সঙ্গে বেরিয়ে আসবে প্রচণ্ড শক্তি যেটা শহরকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। এইভাবে তৈরি হলো আণবিক বোমা। আণবিক বোমার অসুবিধে হলো, বড়ো বোমা তৈরি করতে ইউরেনিয়াম (২৩৫) বেশি পরিমাণে লাগবে। এটা জোগাড় করা শক্ত এবং দামও খুব বেশি। হাইড্রোজেন বোমাতে সূর্যের কায়দায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি করে শক্তি বের করা হয়। ছোটো একটা আণবিক বোমার সাহায্যে প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেই যেখানে যতো হাইড্রোজেন আছে সব জুড়ে হিলিয়াম হয়ে যাবে। তোমরা জানো, জলে হাইড্রোজেন আছে। সারা পৃথিবীতে সমুদ্রের জলের অভাব নেই। একটা হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দিলে একের পর এক সব জলবিন্দু ভেঙে গিয়ে পৃথিবীটা সূর্যের মতো একটা অগ্নিপিণ্ড হয়ে যাবে। এখনও রক্ষে যে সাধারণ হাইড্রোজেন দিয়ে এখনও এই বোমা তৈরি হয়নি। হয়েছে ডিউটেরন থেকে। ডিউটেরন খুব কম পাওয়া যায়। কাজেই শুধু বিকিনির ধ্বংসলীলা দেখা গিয়েছে।

এই প্রচণ্ড শক্তিকে কি মানুষের কল্যাণে লাগানো যায় না? যায়—যদি ইচ্ছে থাকে। গত জুন মাসে সোবিয়েত দেশে আণবিক শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। সেখানে এক সের ইউরেনিয়াম দিয়ে ২৮০০০ টন কয়লার কাজ করানো হচ্ছে।

বিধাতার চেয়ে বড়ো

আমাদের এই জানবার কথার আসরে চতুর্থ আর পঞ্চম, ছুটি বই জুড়ে, প্রকৃতিকে জয় করবার কাহিনী। সে কাহিনী আমরা শুরু করেছিলাম কী বলে?

বলেছিলাম, প্রকৃতিতে যা নেই মানুষ আজ নিজে হাতে তাই সৃষ্টি করতে শিখেছে। প্রকৃতিতে যা আছে আজকে মানুষ তার জোগান হাজার গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। পঞ্চম বই শেষ করবার আগে আবার সেই কথাতেই ফিরে আসা যাক।

॥ চোখ-জুড়োনো রঙ ॥

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা তো জানোই। বাঙলাদেশে আর বিহারে অনেক জায়গাতে তাদের কুঠি আজো দাঁড়িয়ে আছে।

সে সময়ে এই নীল ছাড়া কাপড় রঙ করা হতো না। তাই তখন নীলের খুব চাহিদা ছিলো। বছরে প্রায় পৌনে ১ লক্ষ মন নীল বিক্রি হতো। তার দাম ১৩ কোটি টাকা। এই নীল তৈরি হতো একরকম গাছ থেকে, তার পণ্ডিতী নাম "ইণ্ডিগোফেরা টিংটোরিয়া"। সোজা বাঙলায় লিখলে নামটা হয়: 'নীল রঙের গাছ'। এই গাছের ডাঁটি আর পাতা জলে পচিয়ে নীল বের করতে হয়। মুনাফার লোভে নীলকর সাহেবরা জোর করে ধানের জমিতে নীল চাষ করাতো—চাষীরা আপত্তি করলে অত্যাচার চলতো। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, বাঙলা এবং বিহারে প্রায় ৪৫ লক্ষ বিঘে জমিতে নীল চাষ হতো। ফলে দেশে ছুর্ভিক্ষ

দেখা দিতো প্রতি বছর। আঠারো শতকের মাঝামাঝি জার্মানির বিখ্যাত রাসায়নিক বেয়ার নীলের রাসায়নিক রূপ আবিষ্কার করলেন $C_{16}H_{10}N_2O_2$। প্রায় কুড়ি বছর ধরে চেষ্টার পর বেয়ার পরীক্ষাগারে কৃত্রিম নীল তৈরি করলেন আলকাতরা থেকে। সেই থেকে শুরু হলো শিল্পে নীল-উৎপাদনের চেষ্টা। সস্তায় কাঁচা মাল জোগাড় করা এবং অল্প খরচে উৎপাদন করা : শিল্পে উৎপাদনের দুটো প্রধান সমস্যা। বেয়ারের কায়দায় নীল তৈরি করলে চাষের নীলের চেয়ে খরচ বেশি পড়ে যায়। কাজেই তখন শিল্পউৎপাদন সম্ভব হলো না। এরও অনেক দিন পরে ১৮৯০ সালে হয়মান এনিলিন থেকে নীল তৈরির একটা নতুন কায়দা বের করলেন। অনেক তোড়জোড় করে উৎপাদন শুরু করে দেখা গেলো তাতেও সুবিধা হচ্ছে না। দাম বেশি পড়ে যাচ্ছে। এই প্রণালীতে সালফিউরিক অ্যাসিড, ক্লোরিন এবং কষ্টিক সোডার দরকার হয়। সেই সময় এগুলি খুব কম করে তৈরি হতো—দামও ছিলো বেশি। আরো কিছুদিন কেটে গেলো। মনে হলো শেষ পর্যন্ত বোধহয় নীল আর কারখানায় তৈরি করা যাবে না। এই ধরনের নৈরাশ্য যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তখন হল্যাণ্ডের দুজন রাসায়নিক ন্যাপথালিন থেকে নীল তৈরি করলেন। ন্যাপথালিন থেকে থ্যালিক এনহাইড্রাইড তৈরি করতে পারলেই বাকিটা খুব সহজ হয়ে যাবে। এইখানে একটু গলদ রয়ে গেলো। যেভাবে থ্যালিক এনহাইড্রাইড তখন তৈরি হতো তাতে খরচ খুব বেশি পড়তো। স্থাপার ন্যাপথালিনে সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে থ্যালিক এনহাইড্রাইড তৈরির একটা উপায়

বের করলেন। এইবার মনে হলো এতোদিনের চেষ্টা বোধহয় সফল হলো। কারখানায় কাজ শুরু হয়ে গেলো। এতোদিন পর্যন্ত কৃত্রিম নীল তৈরির যতোগুলি উপায় আবিষ্কার হয়েছিলো সব কটা পেটেন্ট কিনে নেয় জার্মানির একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান Badische Aniline Und Soda Fabrik। এদের কারখানাতেই চলছিলো নীল তৈরির পরীক্ষা। সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে থ্যালিক এনহাইড্রাইড তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেলো উৎপাদন খুব কম হচ্ছে। ল্যাবরেটরিতে যতো ভালো এবং যতো সহজে করা হয়েছিলো কারখানায় সে রকম হচ্ছে না। এই সঙ্কট ত্রাণ হলো একটা দুর্ঘটনা থেকে। কারখানার একজন কর্মচারীর ত্রুটিবশত একটা থারমোমিটার ভেঙে গিয়ে পারাটুকু ন্যাপথালিন এবং সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো পাত্রে পড়ে গিয়েছিলো। এই পারাটা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে পরিমাণমতো থ্যালিক এনহাইড্রাইড তৈরি সম্ভব করে দিলো। সব বাধা-বিপত্তি কেটে গিয়ে তৈরি হলো নীল। চাষের নীলের চেয়ে এর দাম অনেক কম। আস্তে আস্তে নীলের চাষ বন্ধ হলো। ফসলের জমি আর নীল চাষে লাগবে না, সেই জমিতে ধান-গম হতে পারবে। বছর বছর দুর্ভিক্ষ হবে না। রসায়ন-শিল্প এটা সম্ভব করলো! আজকাল কৃত্রিম নীল তৈরির প্রথার আরো উন্নতি হয়েছে। ন্যাপথালিন থেকে থ্যালিক এনহাইড্রাইড তৈরি করতে আর সালফিউরিক অ্যাসিড দরকার হয় না। ন্যাপথালিন গরম করে যে গ্যাসটা বের হয় তার সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন মিশিয়ে একটা অনুঘটকের (ভ্যোনাডিয়াম পেণ্ট

অক্সাইড) ভেতর দিয়ে চালিয়ে দিলেই থ্যালিক এনহাইড্রাইড তৈরি হয়ে যায়।

চাষ করে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড নীল তৈরি হতো। এর দাম ছিলো ১৩ কোটি টাকা। কারখানাতে আজ তৈরি হচ্ছে প্রায় ২ কোটি পাউণ্ড। অত্যুচ্চ মুনাফা রেখেও এর দাম পড়ে ৮ কোটি টাকা।

॥ মঞ্জিষ্ঠা ॥ নীলের মতো আর একটি গাছ। এর থেকে লাল রঙ তৈরি হতো। এর ইতিহাস নীলের চেয়ে আরো পুরনো। মিশরদেশে মমীদের কাপড় এই রঙ দিয়ে লাল করা হতো। মধ্যযুগে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড এবং আলসাস দেশে খুব বিস্তৃতভাবেই এর চাষ চলতো। এই রঙ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করলেন উইলিয়াম পার্কিন। নীলের মতো আলকাতরা থেকে উৎপাদনের শুরু। ন্যাপথালিন থেকে যেমন নীল তৈরি হয় তেমনি এনথ্রাসিন থেকে হলো লাল রঙ এলিসারিন। মঞ্জিষ্ঠার চাষ উঠে গেলো। এইভাবে আজ লাল, নীল, সবুজ হলদে সব রঙ তৈরি হচ্ছে কলকারখানায় কৃত্রিম উপায়ে! নীলের আবিষ্কারের আগে বছরে প্রায় ১৫ কোটি পাউণ্ড ন্যাপথালিন ফেলে দেওয়া হতো। প্রায় সেই পরিমাণ এনথ্রাসিনও নষ্ট হতো। আর আজ এদের থেকে বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার চোখজুড়োনো রঙ তৈরি হচ্ছে। মানুষের এই অক্ষয় কীর্তির তুলনা প্রকৃতিতেও মেলে না।

॥ মনমাতানো আতর ॥

কালো, দুর্গন্ধময় আলকাতরা থেকে শুধু লাল নীল রঙ তৈরি হয় না। গোলাপ, চামেলী জুই ফুলের সুগন্ধও তৈরি হয়। এক

পাউণ্ড গোলাপের আতর তৈরি করতে প্রায় ৫৪ মন ফুলের পাঁপড়ি লাগে। বুঝতেই পারছো, এভাবে তৈরি হলে আতরের দাম কতো হবে। শোনা যায়, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান গোলাপের আতর খুব পছন্দ করতেন। সুন্দর গন্ধ কে না ভালোবাসে। কিন্তু সে সময় শুধু নূরজাহানের পক্ষেই এই শখ মেটানো সম্ভব হতো—সাধারণ লোকের রোজগার থেকে আতর কেনা চলতো না। আজ রাস্তায় ঘাটে সকলেই অল্পবিস্তর এই সুগন্ধ ব্যবহার করতে পারে। দুর্গন্ধময় আলকাতরা থেকে আজ তৈরি হচ্ছে এমন সব রাসায়নিক পদার্থ যাদের মাপমতো মিশিয়ে দিলে গোলাপের গন্ধ বের হবে। গোলাপের আতর বিশ্লেষণ করে রাসায়নিকরা দেখলেন এতে আছে :

জিরানিওল, সিট্রোনেলল, নিরোল, ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল।

শুরু হলো সংযোজনের কাজ : ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হলো আলকাতরার টোলুইন থেকে। একরকম ঘাস থেকে তৈরি হলো জিরানিওল, সিট্রোনেসাল এবং নিরোল। আলকাতরা থেকে এদের সবাইকে তৈরি করা যায় (নিচে দেখো)। এখনও এদের ঘাস থেকে তৈরিতে খরচ কম পড়ছে। নীলের আবিষ্কারের মতো তোমরা একদিন আরো সস্তায় আলকাতরা থেকে এদের তৈরি করবে। সিট্রাল ঘাসের চাষ উঠিয়ে দেওয়া হবে। এইভাবে নতুন নতুন উপায়ে ফুলের গন্ধ কারখানায় তৈরি হয়। বড়ো বড়ো শিল্প বছরে কোটি কোটি টাকার গন্ধ বিক্রি করছে। কারখানায় সুগন্ধি উৎপাদন—আধুনিক

বিজ্ঞানের একটা বিরাট অগ্রগতির লক্ষণ বলে ধরে নিতে পারি। আজ হাজার হাজার নতুন রাসায়নিক কম্পাউণ্ড তৈরি হচ্ছে সুগন্ধি উৎপাদনের জন্যে। কয়লা →বিউটেন →ব্রোম বিউটেন →মিথাইল হেপটানোন →জিরানিওল এবং নিরোল।

॥ কয়লা থেকে মাখন ॥

চিরকাল গোরু ও মহিষের দুধ থেকেই মাখন পাওয়া যায়। এই কথাই আমরা শুনে এসেছি। শরীরের পুষ্টির জন্যে একটু দুধ-মাখন সকলেরই খাওয়া উচিত। দুধ মাখন জুগিয়ে গোরু আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে—সেই জন্যেই 'মা বসুন্ধরার' মতো গোরুকেও পুজো করা হতো ফুল-বেলপাতা দিয়ে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সামান্য পশুর পুজো করবে! বিজ্ঞান সেটা বরদাস্ত করলো না। গোরুকে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ খাইয়ে সে তার দুধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলো। তারপর কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করলো ভালো জাতের গোরু যারা বেশি দুধ দেবে।

কিন্তু এইখানেই তার প্রচেষ্টা শেষ হয়নি। গোরুকে বাদ দিয়েই মানুষ দুধ-মাখন তৈরি করবে। দেখা গেলো মাখনে কতোগুলি জৈব অ্যাসিড এবং গ্লিসারিন সংযুক্তভাবে রয়েছে। এর জৈব অ্যাসিডগুলি বিভিন্ন তেল থেকে পাওয়া যায়। গ্লিসারিন তৈরি হয় চর্বি থেকে। চর্বি থেকে গ্লিসারিন পেতে হলে আবার সেই গোরুকে দরকার হবে। কাজেই খোঁজা হলো অন্য উপায়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, প্রপিলিন থেকে গ্লিসারিন তৈরি করা যায়। কয়লা থেকে প্রপিলিন পাওয়া খুব সহজ।

কিন্তু গ্লিসারিন যতো সহজে তৈরি হয় অ্যাসিডগুলি তৈরি তার চেয়ে ঢের শক্ত। মাখনে যে সব অ্যাসিড তাদের নাম নিচে দিলাম :

বিউটিরিক—	$C_3 H_7 COOH$
ক্যাপরোইক—	$C_5 H_{11} COOH$
ক্যাপ্রাইলিক—	$C_7 H_{15} COOH$
ক্যাপ্রিক—	$C_9 H_{19} COOH$
ল্যারিক—	$C_{11} H_{23} COOH$
মাইরিস্টিক—	$C_{13} H_{27} COOH$
পামিটিক—	$C_{15} H_{31} COOH$
ষ্টিয়ারিক—	$C_{17} H_{35} COOH$
আরাকাডিক—	$C_{19} H_{39} COOH$
ওলেইক—	$C_{17} H_{33} COOH$

ওপরের ফরমুলাগুলিতে প্রত্যেক অ্যাসিডে—COOH আছে। এই ধরনের পরমাণুর জোট জৈব রসায়নে অ্যাসিড-জাতীয় পদার্থে থাকে। এদের "কারবক্সিল রাডিক্যাল" বলা হয়। ওলেইক অ্যাসিড ছাড়া অন্য সব কটাতে দেখবে বাঁদিকের কার্বন এবং হাইড্রোজেন একটা বিশেষ নিয়মে মেশানো রয়েছে। দুটো কার্বন থাকলে ৫টা হাইড্রোজেন, ৩টে কার্বনে ৭টা, ৫টা কার্বনে ১১টা, এইভাবে। সংক্ষেপে $C_n H_{2n + 1}$ এইভাবে লেখা চলে। এই ধরনের পরমাণু সমন্বয়কে বলা হয় "এলকীল র‍্যাডিক্যাল"। অ্যালিফেটিক জাতীয় পদার্থের এরাই হলো সূচনা। কয়লা থেকে হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। কার্বন আর হাইড্রোজেনের সংযোগে সৃষ্টি বলেই তাদের হাইড্রোকার্বন নাম হয়েছে।

এই হাইড্রোকার্বন থেকে ওপরের অ্যাসিডগুলি তৈরি করবার চেষ্টা চলতে লাগলো। কয়লার ভেতরে বাষ্প চালিয়ে দিলে বিশেষ অবস্থায় বাষ্প ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আলাদা হয়ে যায়। বাষ্পের এই হাইড্রোজেন আর কয়লা পুড়ে হয় কার্বন মনঅক্সাইড। এদের সংযোগে নানা রকম জিনিস তৈরি হতে পারে, এইভাবেই হাইড্রোকার্বনগুলি তৈরি হলো। CH_4, $C_1 H_6$, $C_3 H_8$, $C_4 H_{10}$, C_5 111 ইত্যাদি হাইড্রোকার্বনের বংশধর। ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে, যে এই হাইড্রোকার্বনগুলিতে যদি দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু পালটে দুটো অক্সিজেনের পরমাণু ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলেই অ্যাসিড পাওয়া যাবে। যেমন ধরো বিউটিরিক অ্যাসিড : এর ফরমুলা হলো, $C_3 H_8 O_1$ আর হাইড্রোকারবন বিউটেনের ফরমুলা হলো $C_4 H_1$। ঠিক এইভাবে সব অ্যাসিডগুলি তৈরি করে গ্লিসারিনের সঙ্গে জুড়ে দিলেই পাবে মাখন।

আণবিক শক্তিতে যখন আমাদের কলকারখানা চলবে তখন কয়লাই জোগাবে আমাদের খাদ্য। একজন বিলেতী পাদ্রী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলেছিলেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে না খেয়ে মরতে হবে। তাঁর মতে, পৃথিবীর খাদ্যভাণ্ডার বাড়তি জনংখ্যার সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না। সেই ভদ্রলোকের নাম মালথুস। আমেরিকার যুদ্ধবাজেরা আণবিক বোমা ফেলে হাজার হাজার লোক হত্যা কবার স্বপক্ষে মালথুসের যুক্তি দেখায়। তাদের মতে এই হত্যাকাণ্ড আসলে "উদবৃত্ত জনসাধারণকে" সহজভাবে কমিয়ে দেওয়া। মালথুস একটা

কথা ভুলে গিয়েছিলেন, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে সেই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও উন্নতি হচ্ছে। শুধু মাঠের ফসল বাড়িয়েই নয়, নতুন নতুন জিনিস আজ আমরা খাদ্য হিসাবে পেয়েছি। ন্যায্য সমাজব্যবস্থা থাকলে কোনদিন কারো খাদ্যের অভাব হবে না। একথা বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে, মালথুসের কথা সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

ভাববার কথা

শিল্প উৎপাদনে দুই ধরনের জিনিসের কথা ভাবতে হয়—কাঁচা মাল এবং উৎপাদনের কায়দা। আজ পর্যন্ত শিল্পে যে সব কাঁচা মাল ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে ধাতু, পাথর, মাটি, কাঁচ, পশুর চামড়া ও লোম, কাঠ এবং কাগজ এরাই প্রধান। লক্ষ্য করলেই দেখবে যে, এই সব জিনিসগুলির ব্যবহার মানুষ অনেকদিন আগেই শিখেছিলো। আধুনিক শিল্পে এদের উৎপাদন অনেক গুণ বেড়েছে, তাছাড়া এদের হাজার রকম নতুন ব্যবহার শুরু হয়েছে। কাঁচা মালের ব্যবহার সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে দেখা যাক। ভারি ধাতুর ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে হালকা ধাতুর দিকে নজর দিতে হবে। উড়োজাহাজে অ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার শুরু হওয়াতে এর প্রচলন হয়েছে। এ ছাড়া ম্যাগনেসিয়াম এবং বেরিলিয়ামকে অনেক বেশি কাজে লাগানো চলতে পারে। এর ফলে যন্ত্রপাতি অনেক হালকা হবে, টানাটানি করবার অসুবিধা হবে না। লোহা এবং ইস্পাতের অজস্র ব্যবহার না করে শুধু ধাতু কাটবার টুল তৈরির জন্যে রেখে দিলেই চলবে। আজকাল আমরা ধাতুর কৃষ্টাল রূপ জানতে পারি। ভবিষ্যতে কৃষ্টাল রূপ পালটে দিয়ে যে কোনো ধাতুকে প্রয়োজনমতো শক্ত এবং ইলাসটিক করা যাবে। কাগজের মতো পাতলা ধাতুকে মোটা রডের চেয়েও শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। পুরনো জিনিস আঁকড়ে না ধরে এদের দিকেই দৃষ্টি দিতে বিজ্ঞান বলছে। এই ধরনের পাতলা ধাতু তৈরি হলে রাসায়নিক এবং

বৈদ্যুতিক শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হবে। খনি থেকে কয়লা তোলা আজো বিপজ্জনক কাজ। খনি-মজুরদের কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় তা তোমরা জানো। সোবিয়েত দেশে আজ খনির ভেতর কয়লা পুড়িয়ে গ্যাস তৈরি হচ্ছে। এই প্রথায় কয়লা কেটে তোলার হাঙ্গামা থাকবে না। তাছাড়া হাইড্রোমাইনিং কায়দাতে, খুব জোরে জল চালিয়ে দিয়ে খাদে কয়লা কাটা এবং ওপরে তোলা দুটোই সম্ভব। সোবিয়েত ডনবাসের অনেক খনিতে এই কায়দা চালু হয়েছে। ধাতুর বেলায় খনিজ থেকে ধাতু তৈরির কায়দার অনেক পরিবর্তন করা সম্ভব। বড়ো বড়ো কয়লার উননে খনিজকে পরিশোধন না করে রাসায়নিক প্রক্রিয়া কিংবা বৈদ্যুতিক ইনডাকশন উনন ব্যবহার করা চলে। আজকাল ম্যাগনেসিয়াম তৈরি রাসায়নিক কায়দায় স্বতশ্চল এবং অবিচ্ছন্নভাবে চলে। লোহার কারখানাতে ব্লাষ্ট ফারনেসের বদলে অনেক কম তাপে গ্যাস ও তেলের সাহায্যে খনিজ থেকে লোহা তৈরি আজ সম্ভব। ভবিষ্যতের দৃষ্টি সেই দিকে। বড়ো বড়ো ঢালাই করা লোহার যন্ত্রপাতি আজকেও চলছে। এরা যেমন ভারি তেমনি ঠুনকো। এদের বদলে ছোটো টুকরোকে ওয়েল্ড করে জোড়া দিলে অনেক হালকা এবং শক্ত জিনিস তৈরি হবে।

পাথর, সিমেণ্ট, ইট, মাটি এবং কাচের ব্যবহার আরো অনেক দিন চলবে। সিমেণ্ট-কংক্রীট বাড়ি তৈরির কাজে অনেক জায়গাতেই লোহা এবং ইস্পাতকে হটিয়ে দিয়েছে। কড়ি-বড়গা লোহার বদলে কংক্রীটের তৈরি হচ্ছে। কাঁচের ব্যবহার এখনও

শুধু গৃহস্থালির কাজেই চলছে। জানলা-দরজাতে লাগানো ছাড়া ভারি কাজে এদের লাগানো হয় না। আজ আমরা এমন কাঁচ তৈরি করেছি যেটা কর্কের চেয়েও হালকা অথচ ইটের মতো শক্ত। তাপ, শব্দ কোনো কিছুই এদের ভেতর দিয়ে যেতে পারে না। বাড়ির ছাদ, মেঝে, দেওয়াল সবকিছু এদের দিয়ে তৈরি করলে অনেক ভালো বাড়ি হবে অনেক কম পরিশ্রমে।

কাপড় তৈরি আজো সেই পুরনো কায়দায় চলেছে। সুতো পাকানো, বোনা, শেলাই করা ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে কাঠের গুঁড়ো থেকে কাপড় তৈরি। কৃত্রিম পশম এবং কৃত্রিম শিল্কের কথা অবশ্য বলতে হবে। তা সত্ত্বেও আজ আমরা এমন কাপড়ের কথা ভাবতে পারি, যাকে বুনতে হবে না, শেলাই করতে হবে না, প্লাসটিকসের পরদার মতো শুধু ঢালাই করলেই চলবে। খুব সূক্ষ্ম-ছিদ্র-ওয়ালা প্লাসটিক্স তৈরি করতে পারলেই সেটা সম্ভব হবে। কিন্তু মুশকিল হলো, এগুলি চালু হলে কাপড়ের কলে ছাঁটাই হবে।

এই রকম সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা উৎপাদনের উন্নতির পথে কতো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার করতে হলে চাই যুক্তিসঙ্গত সমাজ। প্লাসটিকসের আবিষ্কার এক বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের হাজার রকম জিনিস ধাতুর বদলে প্লাসটিকস্ দিয়ে তৈরি হচ্ছে। কাপড় এবং কাগজের বদলে অনেক ক্ষেত্রে আজ পলিভিনাইল ক্লোরাইড প্লাসটিকস্ লাগানো হয়। এই প্লাসটিকসদের অণুর গঠন আমরা

জেনেছি। নানা রকম শিকলের মতো অণুরা সাজানো আছে। এই সব অণুদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারলে প্রয়োজনমতো গুণাগুণ তাতে হবে। খুব পাতলা প্লাসটিকসকে শক্ত এবং ইলাস্টিক করা যাবে। তখন অনেক ধাতুর বদলে এদের ব্যবহার সম্ভব হবে। আধুনিক উৎপাদনের মূলে রয়েছে যন্ত্র তৈরির ব্যবস্থা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যন্ত্র তৈরি হচ্ছে উৎপাদনের খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে। কম শ্রমিক দিয়ে বেশি কাজ করিয়ে মুনাফা বাড়িয়ে নেবার কথা ভেবেই এরা নতুন যন্ত্রের পরিকল্পনা করে।

অশিক্ষিত মজুর দিয়ে যন্ত্র চালাতে পারলে মজুরি কম লাগবে। সেইজন্যে একটানা এবং একঘেয়ে কাজগুলি মজুরদের জন্যে থাকে। ফোটো ইলেকট্রিক সেলের সাহায্যে এই ধরনের কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু এদের প্রচলন হয় না। কারণ মেয়ে-মজুর এবং শিশুদের দিয়ে অনেক কম খরচায় এইকাজ করিয়ে নেওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্মত শিল্পের লক্ষ্য হবে মানুষের দেহযন্ত্রের নকলে কারখানা তৈরি করা। আমাদের মস্তিষ্ক যেমন একজায়গা থেকে সুষ্ঠুভাবে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করে তেমনি আধুনিক কারখানা চলবে একটা "কন্ট্রোল রুম" থেকে। এই ঘর থেকেই শ্রমিক চালাবে সমস্ত কারখানা। কেবল যন্ত্র বিকল হলেই দৈহিক পরিশ্রমের দরকার হবে।

আধুনিক শিল্পের মূলে রয়েছে প্রকৃতির শক্তির ব্যবহার। শক্তি উৎপাদনের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে গিয়েছে। যদিও আধুনিক এঞ্জিনে কয়লার তাপের ৫০ ভাগ নষ্ট করা হয়।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে শক্তির আরো বেশি অপচয় হয়। ছোটো ছোটো এলাকাতে আলাদা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র থাকার ফলে বিদ্যুৎ তৈরির খরচ বেশি পড়ে। একটা বড়ো কেন্দ্র মাঝখানে রেখে পুব-পশ্চিমে ৫।৬ হাজার মাইল জায়গা জুড়ে সরবরাহ করলে দিনে রাত্রে সমান পরিমাণে বিদ্যুতের চাহিদা থাকবে। কেন্দ্রটি ২৪ ঘণ্টা সমানভাবে চালু থাকবে—উৎপাদনের খরচ অনেক কম পড়বে। বিদ্যুৎ ধরে রাখবার কায়দার উন্নতি করতে পারলে ভবিষ্যতে আমরা Tidal power থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবো।

আধুনিক যুগে যানবাহনের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এদের উৎপাদনে যে বিশৃঙ্খলা আজো চলেছে তার ফলে এদের ভালোভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান উড়োজাহাজ চলাচল শুধু যুদ্ধের সময় লাভজনক, অসামরিক কাজে নয়। টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন, ফটকা বাজার এবং চুরি-ডাকাতির খবর পাঠাবার কাজে বেশি ব্যবহার হয়। সিনেমা, রেডিও এবং ছাপাখানা, আমেরিকানদের গুণ্ডাবাজী এবং অশ্লীল দৃষ্টিভঙ্গির যথেচ্ছ পরিবেশন করছে। বেতারে খবর আদান-প্রদানের যন্ত্র কাজে লাগছে পুলিসের বেতার ভ্যানে—জনসাধারণের ওপর জুলুম চালাতে। এই সব অপব্যবহার না হলে বিদ্যুতের শক্তির সাহায্যে আমাদের জীবনধারণ আরো সহজ করা যেতো।

শরীরতত্ত্বের জ্ঞান বৃদ্ধি হলে, ভবিষ্যতে বিদ্যুতের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রখরতাকে বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। আজ যে সব জিনিস খালি চোখে দেখা যায় না তাদের দেখতে পাবো।

আজ যে শব্দ কানে শুনতে পাই না তাদেরও শুনতে পাবো। আজ যাদের অনুভব করতে পারছি না তাদেরও অনুভব করতে পারবো।

পুঁজিবাদী সমাজ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে শুধু মুনাফা বাড়ানোর হাতিয়ার হিসাবে। বিজ্ঞানের উপযুক্ত ব্যবহারে সাধারণ মানুষের কতো সুখসুবিধা হতে পারে সেটা আজ নতুন পৃথিবীর দিকে তাকালেই দেখতে পাবে।



জানবার কথা শিখতে তো ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তাহলে আবার 'জানবার কথা' কেন?

একটা সাদামাটা জবাব আছে।

ইস্কুলের বই ছাড়াও ছেলেমেয়েরা আরো কিছু কিছু বই পড়তে চায়। পড়েও। ইস্কুলেও পড়ে, ইস্কুলের বাইরেও পড়ে।

আমরা ইস্কুলের আঙিনার বাইরেই ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসর জমাতে চেয়েছি। এ-আসরে বোঝা না-বোঝার সঙ্গে পাস-ফেলের সম্পর্ক নেই। ওরা তাই সহজ হয়ে শুনছে, আমরাও সহজ করে বলছি।

বিদেশী বুক অফ নলেজ ধরনের বই-গুলির মতো 'জানবার কথা' প্রধানতই পাতা উলটে ছবি দেখবার বই নয়। ছবির বই আর পড়বার বই— দুইই। এতো হাজার বছরের চেষ্টায় মানুষ যে-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেয়েছে তারই সারাংশ সহজ করে বলা হয়েছে 'জানবার কথা'য়।



সম্পাদিত

১০ খণ্ডের তালিকা

এক ॥ বিজ্ঞান
দুই ॥ ইতিহাস
তিন ॥ ইতিহাস
চার ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
পাঁচ ॥ যন্ত্রকৌশলের কথা
ছয় ॥ পৃথিবীর খবর
সাত ॥ অর্থনীতি-রাজনীতি
আট ॥ সাহিত্য
নয় ॥ চারুশিল্প
দশ ॥ দর্শন